বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩২ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২১

খাদ্য নিরাপত্তার অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

কাজী সাহাবউদ্দিন*
সিবান শাহানা**

১। ভূমিকা

২০০৮ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও খাদ্য মন্দার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এসময়ে বিশ্ব বাজারে খাদ্যের মূল্য অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিশ্ব বাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজার উভয় ক্ষেত্রেই খাদ্য মূল্য ক্রমশ হ্রাস পায়; তবুও বর্তমানে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি পূর্বের তুলনায় একটি নাজুক অবস্থায় রয়েছে। এমতাবস্থায় জাতীয় নীতিনির্ধারক পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। খাদ্যের প্রাপ্যতা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ বা ক্ষমতা, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্য পরিস্থিতির নাজুকতা হ্রাসকরণ ইত্যাদি একাধিক জটিল বিষয়ের উপর খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নির্ভরশীল।

২০১১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ কোটি, যা ১৯৭১ সালের জনসংখ্যার (৭ কোটি) তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এই বিশাল জনগোষ্ঠী এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা হয়েছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত (Mujeri and Sen 2006)। মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি মৌলিক মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু এই অব্যাহত উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে- যেমন উচ্চ দারিদ্র্য হার, ক্রমবর্ধমান অসমতা, খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি ইত্যাদি। ১৯৯০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিগত কুড়ি বছরে দারিদ্র্যের হার ৬০ শতাংশ থেকে কমে ৩১.৫ শতাংশে পৌঁছালেও এখনও প্রায় ৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে (BBS 2012)।

আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর মনে হলেও এটি সত্য যে, যেই দেশটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সফলভাবে অগ্রসর হচ্ছে এবং একইসাথে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে, সেই দেশটিকেই খাদ্যের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দৃশ্যমান না হলেও রূঢ় বাস্তবতা হলো এই যে, এখনও বাংলাদেশে অসংখ্য মানুষ খাদ্য নিরাপত্তার অভাবে ভোগে। এসকল দরিদ্র মানুষ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে এবং তাদের দিন কাটে পরিবারের সদস্যের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করার দুশ্চিন্তায়। খাদ্য ঘাটতির মতো বিষয়গুলো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় তখনই

* প্রফেসরিয়াল ফেলো, বিআইডিএস।
** রিসার্চ এসোসিয়েট, বিআইডিএস।

যখন ২০০৭-২০০৮ সালের মতো খাদ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এধরনের জরুরি অবস্থা ব্যতীত অন্য সময়ে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি কম গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো খাদ্য নিরাপত্তা কেবলমাত্র কৃষি, প্রযুক্তি এবং বাণিজ্যের সাথে যুক্ত নয়। এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে একাধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় যা খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যুটিকে একটি জটিল সমস্যায় পরিণত করে।

উপরোক্ত পটভূমিতে এই প্রবন্ধে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার বর্তমান অবস্থার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রবন্ধটির প্রথম অংশে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জনগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে, দ্বিতীয় অংশে সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তৃতীয় অংশে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সম্ভাবনার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

২। খাদ্য নিরাপত্তা : প্রেক্ষিত অর্জন

২.১। খাদ্য উৎপাদনের ক্রমধারা

খাদ্য উৎপাদনের সাফল্যকে সাধারণত খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন প্রবৃদ্ধির নিরিখে বিচার করা হয়। বাংলাদেশে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে ধান, গম, আলু, ডাল, তৈলবীজ, আখ, ফলমূল ও মশলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল ফসল মোট ক্যালরি ও প্রোটিনের প্রায় ৮০ শতাংশের যোগান দেয়। বাকি ২০ শতাংশের সরবরাহ আসে দুধ, ডিম, মাংস প্রভৃতি অকৃষিজাত খাদ্য থেকে।

ধান উৎপাদনের ধারা

ধান বাংলাদেশের প্রধান ফসল। মোট উৎপাদনের প্রায় ৭০ শতাংশই হলো ধান এবং কৃষি জমির প্রায় ৭৫ শতাংশে ধান চাষ করা হয়। একারণে ফসল উৎপাদনে সাফল্যের অনেকটাই ধান উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। মৌসুম ভেদে বিভিন্ন জাতের ধানের উৎপাদন, ফলন ও আবাদকৃত জমির পরিমাণের প্রবৃদ্ধির চিত্র সারণি ১-এ তুলে ধরা হলো। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে (১৯৭৩-২০১০) ধানের উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ২.৮ শতাংশ, যা প্রধানত ফলন বৃদ্ধির (২.৬ শতাংশ) কারণেই সম্ভব হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, এই কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের পিছনে প্রজাতি ভেদে ফলন বৃদ্ধির যতটা অবদান তার চেয়ে অনেক বেশি অবদান অধিকাংশ ধানী জমিতে স্থানীয় প্রজাতির পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির ধানের চাষ। বিগত চার দশকে স্থানীয় প্রজাতির ধানের ক্ষেত্রে ফলনের প্রবৃদ্ধির হার মাত্র ১.১ শতাংশে এবং উচ্চ ফলনশীল ধানের প্রবৃদ্ধির হার মাত্র ০.৮ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (সারণি ১)।[১]

[১]দুটি প্রতিবন্ধকতাকে (constraints) এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রথমত, এককভাবে ধান চাষের ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস এবং দ্বিতীয়ত, চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে তুলনামূলকভাবে কম উপযোগী জমিতেও উফশী ধানের চাষ।

সারণি ১

বাংলাদেশে ধানের জন্য চাষকৃত জমির পরিমাণ, ফলন ও উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হারের ধারা

(শতকরা হার)

শস্য	১৯৭২/৭৩-২০০৯/১০			১৯৭২/৭৩-১৯৭৯/৮০			১৯৮০/৮১-১৯৮৯/৯০			১৯৯০/৯১-১৯৯৯/০০			২০০০/০১-২০০৯/১০		
	জমির পরিমাণ	ফলন	উৎপাদন	জমির পরিমাণ	ফলন	উৎপাদন	জমির পরিমাণ	ফলন	উৎপাদন	জমির পরিমাণ	ফলন	উৎপাদন	জমির পরিমাণ	ফলন	উৎপাদন
আউশ (স্থানীয়)	-৫.৮৬	১.৩৫	-৪.৫১	-১.৬৯	০.৯০	-০.৭৯	-৩.১৭	১.৯২	-১.২৫	-৬.৩১	০.১৬	-৬.১৫	-১২.১১	০.৫২	-১১.৫৯
আউশ (উচ্চ ফলনশীল)	২.০৩	-০.৪৩	১.৬০	২৩.৩০	-৩.৪২	১৯.৭৮	-১.৭০	-২.৬৫	-৪.৩৫	২.৩৫	০.৯৮	১.৩৭	৪.৩৬	১.৪৭	৫.৮৩
আউশ (মোট)	**-৩.৯২**	**১.৮১**	**-২.১১**	**০.০৯**	**২.৮৩**	**২.৯৩**	**-২.৯৩**	**০.৭৯**	**-২.১৪**	**-৪.১২**	**০.৯১**	**-৩.২১**	**-৩.৭০**	**২.৪০**	**-১.৩০**
আমন (স্থানীয়)	-২.৯৮	০.৬৩	-২.৩৫	০.৪৫	৩.৪০	৩.৮৫	-৩.০২	১.২০	-১.৮১	-২.৯৩	-০.৭৫	-৩.৬৮	-৬.২৭	-০.৫৮	-৬.৮৫
আমন (উচ্চ ফলনশীল)	৬.০৬	০.৫০	৬.৫৬	২.২৭	০.৬৪	২.৯১	৫.৪৬	০.৭৭	৬.২৩	২.৩০	-০.৪৬	১.৮৪	**৩.৪২**	-০.১৬	৩.২৬
আমন (মোট)	**-০.২০**	**১.৭৫**	**১.৫৫**	**০.৬৭**	**২.৯১**	**৩.৫৮**	**-১.১৭**	**১.৯০**	**০.৭৩**	**-০.৭৭**	**০.০৮**	**-০.৬৮**	-০.৫৯	**০.৬০**	**০.০১**
বোরো (স্থানীয়)	-৩.৬৫	১.১০	-২.৫৫	-৩.৮০	-১.৫৩	-৫.৩৩	-৩.৫৫	-২.৪১	-৫.৯৭	-২.৫৩	১.৪০	-১.১৩	-৭.৪৭	০.২৭	-৭.২০
বোরো (উচ্চ ফলনশীল)	৬.৬৪	০.৮৫	৭.৪৯	৪.৫৯	-২.৪৮	২.১২	১১.২৬	-০.৭০	১০.৫৬	৪.১৭	১.৮৪	৬.০০	**৩.৫৩**	০.৮৩	৪.৩৬
বোরো (মোট)	**৪.৭৫**	**১.৮০**	**৬.৫৫**	**০.৮৩**	**-০.৭৫**	**০.০৮**	**৮.০৮**	**০.৩৫**	**৮.৪২**	**৩.৫৮**	**২.০৮**	**৫.৬৬**	**২.৮৬**	**২.৭৮**	**৫.৬৪**
চাল (স্থানীয়)	**-৩.৭৩**	**১.১২**	**-২.৬১**	-০.৫০	**২.৪৩**	**১.৯৩**	-৩.০৮	**১.১৯**	**-১.৮৯**	-৩.৭৮	-০.২২	-৪.০০	**-৭.৯৫**	-০.৩৫	-৮.৩০
চাল (উচ্চ ফলনশীল)	**৫.৭৯**	০.৭৭	৬.৫৬	৬.১২	**-১.২৮**	**৪.৮৪**	৬.৯৯	০.১১	৭.১০	৩.২৪	০.৯৯	৪.২৩	৩.৮১	১.০২	**৪.৮৩**
চাল (মোট)	০.২১	**২.৫৯**	**২.৮০**	০.৫২	**২.২৮**	**২.৮০**	-০.০৬	**২.৩৮**	**২.৩২**	-০.০৪	**১.৮১**	**১.৭৭**	**০.১৯**	**২.৫৯**	**২.৭৮**

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং লেখকের গণনা।

নোট: Semi-log function ব্যবহার করে প্রবৃদ্ধির হার নিরূপণ করা হয়েছে।

বোরো এবং আমন মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল ধানের বহুল প্রচলন প্রবৃদ্ধির ধারাকে তরান্বিত করে।[২] সত্তরের দশকে উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ করা হতো মোট চাষকৃত জমির মাত্র শতকরা ১৫ ভাগে। আশির দশকে তা প্রায় দ্বিগুণে পরিণত হয় এবং নব্বইয়ের দশকে দেখা যায় যে মোট আবাদকৃত জমির অর্ধেকের বেশি অংশেই উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের চাষ হচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১-২০১০ সময়কালে প্রায় ৬৮ শতাংশে উন্নীত হয়। ফলস্বরূপ সত্তরের দশকে মোট উৎপাদনে যেখানে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের অংশ ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ, নব্বইয়ের দশকে তা প্রায় ৭০ শতাংশে পৌঁছে। বর্তমানে এই সংখ্যাটি বৃদ্ধি পেয়ে ৮০ শতাংশের

[২] ১৯৭২-৭৩ থেকে শুরু করে ২০০৯-১০ এর মধ্যবর্তী সময়ে উফশী বোরো এবং উফশী আমন ধানের অধীনে চাষকৃত জমির প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৬.৬ ও ৬.১ শতাংশ। এর ফলে সার্বিকভাবে এই সময়কালে উফশী ধানের অধীনে চাষকৃত জমির পরিমাণের এবং উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৫.৮ ও ৬.৬ শতাংশ (সারণি ১)।

কাছাকাছি পৌঁছেছে। একই ধারাবাহিকতায় মোট উৎপাদনে এবং চাষকৃত জমিতে স্থানীয় প্রজাতির ধানের আবাদ ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে (সংযুক্তি-সারণি ১)।

বিভিন্ন সময়কালে ধান উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, স্বাধীনতা পরবর্তী তিন দশকে ধানের উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটা নিম্নমুখী ধারা বিরাজ করেছে। বিগত দশকে অবশ্য এই ধারাটি পাল্টে গেছে (সারণি ১)। সত্তরের দশকে যেখানে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.৮ শতাংশ, আশির দশকে তা হ্রাস পেয়ে ২.৩ শতাংশে পৌঁছে। নব্বইয়ের দশকেও এই ধারা অব্যাহত থাকে এবং এই দশকে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১.৮ শতাংশ। ২০০০ সালের পরবর্তী সময়ে এই ধারার পরিবর্তন ঘটে এবং প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ২.৮ শতাংশে পৌঁছে।[৩] প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী ধারার পিছনে চাষকৃত জমির পরিমাণ হ্রাস এবং ফলন হ্রাস উভয়ই দায়ী। বিগত দশকে (২০০০-২০১০) এই ধারার পরিবর্তন প্রধানত ফলনের হার বৃদ্ধির (২.৬ শতাংশ) ফলেই সম্ভব হয়েছে।

ধান ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদনের ধারা

ধান বাদে অন্যান্য প্রধান খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে তাদের উৎপাদন, ফলন ও চাষাবাদকৃত জমির পরিমাণের প্রবৃদ্ধির হার সারণি ২-এ তুলে ধরা হলো। বিগত চার দশকে আলু, গম, সবজি, মশলা ও তৈলবীজ প্রভৃতি ফসলের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে (বাৎসরিক ৩ শতাংশের অধিক হারে), যদিও বিভিন্ন দশকে সমান হারে প্রবৃদ্ধি ঘটেনি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, সত্তরের দশকে (এবং নব্বইয়ের দশকেও) গমের উৎপাদন প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি উভয়ের সমান প্রভাব রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে গমের ক্ষেত্রে চাষকৃত জমির পরিমাণ বেশ হ্রাস পাওয়ায় ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে।[৪] অপরদিকে বিগত দশকগুলোতে তৈলবীজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার অত্যন্ত কম ছিল (আশির দশকে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধিও লক্ষ করা গেছে)। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তৈলবীজ চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তৈলবীজ উৎপাদনে যে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ করা গেছে তার প্রধান কারণ ফলন বৃদ্ধি।[৫]

---

[৩] উল্লেখিত ১০ বছরের উৎপাদনের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই দশকের প্রথমার্ধে চাষকৃত জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় (-০.৭%) এবং ফলন সামান্য পরিমাণে (১.৫%) বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ০.৮ শতাংশ। এই দশকের শেষার্ধে চাষকৃত জমি (২.২%) এবং ফলন (২.৯%) উভয়ই বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে (৫.১%) বৃদ্ধি পায়।

[৪] উপযোগী কৃষি পরিবেশের (favourable agroecological environment) কারণে ভুট্টার চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। গমের তুলনায় উচ্চ উৎপাদনশীলতা ও লাভজনক হওয়ায় এবং হাঁস-মুরগীর খাদ্য (poultry feed) হিসেবে ব্যাপক চাহিদার কারণেও ভুট্টার চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[৫] বাজারে চাহিদা, উচ্চফলনশীল প্রজাতির বীজ এবং উপযোগী কৃষি পরিবেশের কারণে সাম্প্রতিককালে তৈলবীজের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে (Hossain and Deb 2011)।

সারণি ২

বাংলাদেশে অন্যান্য ফসলের জন্য চাষকৃত জমির পরিমাণ, ফলন ও উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হারের ধারা

(শতকরা হার)

শস্য	১৯৭২/৭৩-২০০৯/১০			১৯৭২/৭৩-১৯৭৯/৮০			১৯৮০/৮১-১৯৮৯/৯০			১৯৯০/৯১-১৯৯৯/০০			২০০০/০১-২০০৯/১০		
	জমির পরিমাণ	ফলন	উৎপাদন	জমির পরিমাণ	ফলন	উৎপাদন	জমির পরিমাণ	ফলন	উৎপাদন	জমির পরিমাণ	ফলন	উৎপাদন	জমির পরিমাণ	ফলন	উৎপাদন
গম	৩.০৭	১.৬৯	৪.৭৬	১৬.৭৬	১৩.২৫	৩০.০১	০.৬৯	-২.১০	-১.৪১	৪.৬৩	৩.১২	৭.৭৬	-৯.৪১	০.৪৪	-৮.৯৭
ডাল	০.০২	০.৬৫	০.৬৭	২.৪৭	-১.৬২	০.৮৫	-২.৬৯	০.৭৮	-১.৯১	-৩.০৮	০.৪১	-২.৬৭	-৯.৫৪	২.১৬	-৭.৩৮
তৈলবীজ	০.৮০	২.৩১	৩.১১	১.৫২	০.৫১	২.০৩	-১.৮২	০.৯৯	-০.৮৩	-১.০৬	৩.৫০	২.৪৪	-১.৭৬	১১.৭৬	১০.০০
শাক-সবজি	৩.৫১	১.১১	৪.৬২	১.৮৯	-০.৩৬	১.৫৩	২.৬৮	-০.৫৬	২.১২	৪.২৬	-০.২৪	৪.০১	৬.১৫	১.৩৮	৭.৫৩
আলু	৪.২১	১.৩৭	৫.৫৮	২.২৮	০.৪৯	২.৭৮	০.০৯	০.৩৭	০.৪৬	৬.৭০	১.৪১	৮.১১	৭.০৩	১.৭৬	৮.৭৯
মশলা	২.২১	১.৬৯	৩.৯০	০.৭১	-১.৯৫	-১.২৪	-০.৩১	২.২৩	১.৯২	৫.৭৬	-৩.৭৬	২.০০	১.৯৯	১৪.৪১	১৬.৪০
চা	০.৬৫	১.৪২	২.০৭	-০.২০	৫.৯৯	৬.১৯	০.৬৫	-০.৪১	০.২৪	০.২৩	১.৮৮	২.১২	১.৩০	-০.৩১	০.৯৯
আঁখ	০.০৩	-০.১২	-০.০৯	১.৪৪	০.৫৯	২.০৩	১.৬৪	-১.৩৬	০.২৮	-১.১৭	০.৩৩	-০.৮৪	-৩.৯৮	-০.৪২	-৪.৪০

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং লেখকের গণনা।
নোট: Semi-log function ব্যবহার করে প্রবৃদ্ধির হার নিরূপণ করা হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত সকল ফসলের মধ্যে আলুর উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বিগত চার দশকে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৬ শতাংশ। আলু চাষের এই সফলতার প্রধান কারণ চাষকৃত জমির প্রবৃদ্ধি (৪.২ শতাংশ) এবং আংশিকভাবে ফলন বৃদ্ধি (১.৪ শতাংশ)। এছাড়া বিগত চার দশকে গমের উৎপাদন ও সবজির উৎপাদনেও প্রবৃদ্ধির হার ছিল সন্তোষজনক, যথাক্রমে ৪.৮ ও ৪.৬ শতাংশ। এর প্রধান কারণ হলো এসকল ফসলের ক্ষেত্রে চাষকৃত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, যথাক্রমে ৩.১ ও ৩.৫ শতাংশ। এছাড়া উল্লেখিত অন্যান্য ফসলের মধ্যে আঁখের উৎপাদন বিগত চার দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিগত চার দশকে আখের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্বক (-০.১ শতাংশ)। বিগত চার দশকে ডাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামান্য (০.৭ শতাংশ) প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে ডাল উৎপাদনে আশি ও নব্বই দশক থেকেই ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। ২০০১-২০১০ সালে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল -৭.৪ শতাংশ। এসময় ডাল চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক -৯.৫ শতাংশ হারে)। মশলার চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ (২.২ শতাংশ হারে) ও একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির (১.৭ শতাংশ হারে) কারণে বিগত চার দশকে মশলা চাষে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি (৩.৯ শতাংশ) অর্জিত হয়েছে। বস্তুত বিগত দশকে মশলা উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৬.৪ শতাংশ, যা ফলনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির (১৪.৪ শতাংশ) জন্যই সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে চা চাষের ক্ষেত্রে চাষকৃত জমির পরিমাণ স্বল্প হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় (১ শতাংশেরও কম হারে) তুলনামূলকভাবে চা উৎপাদনে কম প্রবৃদ্ধি হয়েছে (২.১ শতাংশ)।

বিগত দুই দশক ধরে আলু এবং সবজির উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। বিশেষত বিগত দশকে এই প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি ছিল। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা মূল্যের ওঠানামা যার ফলে বাৎসরিক উৎপাদনেও তারতম্য দেখা গেছে। এধরনের শ্রমঘন ও উচ্চ মূল্য সংযোজনকারী ফসলের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত রাখা কঠিন হবে যদি না (১) সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজারজাতকরণ পদ্ধতির উন্নতি ঘটানো হয় যার ফলে বছরব্যাপী ফসলের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে এবং (২) আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পূরণের পর

উদ্বৃত্ত উৎপাদনের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয় যদিও SPS-এর পরিবিধান এবং উন্নত দেশগুলোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে সতর্ক অবস্থানের কারণে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করাটা বেশ কষ্টসাধ্য (Hossain and Deb 2011)।[৬]

গবাদী পশু ও মৎস্য উৎপাদনের ধারা

গবাদী পশুপালন ও খামার হতে প্রাপ্ত তিনটি উল্লেখযোগ্য খাদ্যদ্রব্য হচ্ছে দুধ, ডিম ও মাংস। এসকল খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনের ধারা সারণি ৩-এ তুলে ধরা হলো।[৭]

১৯৯১-২০১০ সময়কালে মাংস ও ডিমের উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে (যথাক্রমে ৯.৫ ও ৯.৬ শতাংশ)। একই সময়ে দুধের উৎপাদন তুলনামূলকভাবে অনেক কম বৃদ্ধি পেয়েছে (৪.১ শতাংশ)। সারণি ৩-এ প্রদর্শিত বিভিন্ন সময়কালে এই তিনটি খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে একই ধরনের ধারাক্রম লক্ষ করা যায়।

সারণি ৩

বাংলাদেশে গবাদী পশুজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনের ধারা : ১৯৯১-২০১০

দ্রব্য	১৯৯১	১৯৯৫	১৯৯৯/০০	২০০৪/০৫	২০০৯/১০	বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার (শতাংশ)				
						১৯৯১-২০১০	১৯৯১-১৯৯৫	১৯৯৫-২০০০	২০০০-২০০৫	২০০৫-২০১০
দুধ (লাখ মেট্রিক টন)	১৩.৪	১৪.১	১৬.০	২১.৪	২৩.৭	৪.০৫	১.৩১	২.৬৯	৬.৭৫	২.১৫
মাংস (লাখ মেট্রিক টন)	৪.৫	৫.১	৬.২	১০.৬	১২.৬	৯.৪৭	৩.৩৩	৪.৩১	১৪.১৯	৩.৭৭
ডিম (সংখ্যায়, কোটি)	২০.৪০	২৫.৩০	৩৫.০০	৫৬.২৩	৫৭.৪২	৯.৫৫	৬.০০	৭.৬৭	১২.১৩	০.৪২

উৎস: Mujeri and Shahabuddin (2001), MoF (2011)), এবং লেখকের গণনা।

নব্বই দশকের প্রথমার্ধে প্রবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে কম হলেও আলোচ্য সময়ের শেষ দশকের প্রথমার্ধে (২০০০-২০০৫) প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিগত দশকের শেষার্ধে (২০০৫-২০১০) প্রাণিজ উৎস হতে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। দুধ ও মাংসের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে। গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগির খামারের জন্য উপযোগী খাদ্যের স্বল্পতা, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি এবং বাজারজাতকরণে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব এক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদের দৃষ্টিকোণ থেকে মৎস্য উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যভ্যাসেও মাছ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সত্তরের দশকে মৎস্য উৎপাদনে স্থবিরতা বিরাজ করছিল, এমনকি এসময়ে মৎস্য উৎপাদনে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে। আশির দশকে এই ধারার পরিবর্তন ঘটে এবং নব্বইয়ের দশকে চাষকৃত মাছের (pond

[৬]মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে প্রচুর বাংলাদেশী অভিবাসী থাকায় এসব দেশে বাংলাদেশী সবজির চাহিদা এবং রপ্তানির বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে।

[৭]Jabbar (2010) এর মতে, HIES ২০০৫-এ উল্লেখিত দুধের প্রকৃত ভোগ এবং সরকারি পরিসংখ্যানে উল্লেখিত উৎপাদন ও প্রাপ্যতার (আমদানিকৃত গুঁড়া দুধসহ) হিসাবে যথেষ্ট গড়মিল লক্ষ করা যায়। এই সন্দেহ সত্য হলে, বাংলাদেশে গবাদী দ্রব্যের (livestock products) বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সত্যিকার চিত্র তুলে ধরা খুবই জটিল হয়ে পড়বে (Shahabuddin *et al.* 2011)।

aquaculture) প্রভূত প্রসারণ ঘটায় মৎস্য উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পায় (সারণি ৪)। সাম্প্রতিককালে (২০০১-২০১০) উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হারে কিছুটা শ্লথ গতি লক্ষ করা গেছে।

সারণি ৪

বাংলাদেশে মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হারের ধারা : ১৯৭২/৭৩-২০০৯/১০

সময়কাল	বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার (%)
১৯৭২/৭৩-২০০৯/১০	৩.৯৩
১৯৭২/৭৩-১৯৭৯/৮০	-৩.৪৪
১৯৮০/৮১-১৯৮৯/৯০	২.৮০
১৯৯০/৯১-১৯৯৯/০০	৬.৯০
২০০০/০১-২০০৯/১০	৫.২৩

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং লেখকের গণনা।
নোট: Semi-log function ব্যবহার করে প্রবৃদ্ধির হার নিরূপণ করা হয়েছে।

২.২। মৌলিক খাদ্য সামগ্রীর মূল্যের অস্থিতিশীলতা রোধের ব্যবস্থাপনা

মূল্যের অস্থিতিশীলতার ফলে ক্রেতাদের অসহায়তা

মূল্যের অস্বাভাবিক ওঠানামার কারণে মূল্যের অস্থিরতা দেখা দেয়। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দামের অস্বাভাবিক ওঠানামা পরিলক্ষিত হয়। মৌসুমী উৎপাদনকে মৌসুমভিত্তিক দামের ওঠানামার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বাংলাদেশের মতো নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে খাদ্য নীতির মূল লক্ষ্য থাকে প্রধান খাদ্যশস্যের মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, যাতে তা নিম্ন আয়ের ভোক্তাগণের ক্রয়সীমা অতিক্রম না করে। খাদ্য মূল্যের দ্রুত বৃদ্ধির কারণে দরিদ্র পরিবারের প্রকৃত আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যায়। দরিদ্র পরিবারের আয়ের বিরাট অংশই ব্যবহৃত হয় খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে। একই সাথে দামের অস্থিতিশীলতা ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে। কৃষকের উৎসাহ ও বিনিয়োগের অভাবে খাদ্য উৎপাদন মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বাধাগ্রস্ত হয়, যা খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে একান্ত প্রয়োজন।

১৯৯৩ সালে খাদ্যশস্যের বাণিজ্য উদারীকরণের আগে সরকার খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করত। সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে আভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ, আমদানি ও সরকারি বিতরণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াগুলোর কোনোটি নগদীকৃত (monetised) চ্যানেল (যেমন OMS- খোলা বাজারে বিক্রি) এবং আবার কোনোটি non-monetised চ্যানেলে যেমন কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় (FFW) এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জন্য ত্রাণ সহায়তা এবং আয়বর্ধক কর্মসূচির অধীনে (যেমন VGD, VGF ইত্যাদি)।

এই সময়কালে দেশীয় বাজার আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাবমুক্ত ছিল, ফলে আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য ও দেশীয় বাজার মূল্যের মাঝে অনেক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বেসরকারি খাতে বাণিজ্য উন্মুক্ত করার ফলে প্রচুর আমদানির কারণে বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের বাজারের কাঠামোগত রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উৎপাদনের ঘাটতির সময়ে (১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালে) খাদ্যশস্য সময়মতো আমদানি বিশেষত ভারত থেকে চাল আমদানি বাজারে সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। তবে সাম্প্রতিককালে খাদ্যশস্যের দামের ঊর্ধ্বগতি

প্রমাণ করে যে, উদার বাণিজ্য-নীতি খাদ্যশস্যের দাম স্থিতিশীল রাখতে সব সময় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না।

আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে রপ্তানিকারক দেশগুলো খাদ্যদ্রব্য রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যা দেশীয় বাজারে খাদ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা ব্যাহত করে। এরূপ পরিস্থিতিতে আভ্যন্তরীণ বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। একই সাথে কৃষকদের প্রণোদনার মাধ্যমে উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার বিষয়টিও সরকারকে খেয়ালে রাখতে হয় (Hossain and Deb 2009)।

খাদ্য মূল্যের অস্থিতিশীলতা

২০০৩ সাল থেকে ২০০৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে চালের পাইকারী ও খুচরা উভয় মূল্যই খুব অস্থিতিশীল ছিল। ২০০৩ সাল এবং ২০০৪ সালের প্রথম ভাগে চালের মূল্য ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পরবর্তীতে ২০০৪ সালের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে ২০০৭ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই মূল্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু করে ২০০৮ সালের এপ্রিল মাস সময় পর্যন্ত চালের মূল্য বাড়তেই থাকে। এর পিছনে কারণ হিসেবে প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলোর চাল রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও ফলে ভবিষ্যতে চালের মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা (speculation) উভয়ই দায়ী। ২০০৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চালের এই উচ্চ মূল্য বজায় থাকে; পরবর্তীতে মূল্য দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে এবং ২০০৯ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ তা হ্রাস পেয়ে ২০০৭ সালে বিরাজমান মূল্যের কাছাকাছি পৌঁছায়। ২০০৮ সালে চালের মূল্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল, কেজি প্রতি ৩৫ টাকা, যা ২০০৩-০৪ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। আটার মূল্যও এসময়ে একই ভাবে ওঠানামা করছিল।

চালের খুচরা মূল্য বৃদ্ধি ধানের মূল্য বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে এবং এর ফলে ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ ধানের মূল্য মন প্রতি ৭৫০ টাকাতে পৌঁছে যার মূল্য ২০০৭ সালের জুন মাসে ছিল মন প্রতি ৫০০ টাকা। এই মূল্য বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয়ে কৃষকেরা শুষ্ক মৌসুমে সেচের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে বোরো ধান চাষ করে এবং ফলস্বরূপ সে বছর ধানের বাম্পার ফলন হয়। ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ ধানের মূল্য বৃদ্ধিতে ছেদ পড়ে কারণ এসময় বাজারে বোরো ধানের সরবরাহ বাড়তে শুরু করে। তবুও তাৎক্ষণিকভাবে চালের দাম হ্রাস পায়নি কেননা তখনও বিশ্ববাজারের চালের ক্রমবর্ধমান মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক এবং মিলারেরা ধান মজুদ করছিল। পরবর্তীতে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে যখন প্রধান চাল উৎপাদনকারী দেশগুলো থেকে অধিক পরিমাণে চাল সরবরাহের সম্ভাবনা দেখা যায় এবং দেশের ভেতরও আমন ধানের ভালো ফলন হওয়ার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় তখন আভ্যন্তরীণ বাজারেও ধীরে ধীরে চালের দাম কমতে শুরু করে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে পাইকারী মূল্য বৃদ্ধি পেলে খুচরা মূল্যও দ্রুত বৃদ্ধি পায় কেননা বিক্রেতারা এই উচ্চ মূল্যটি খুব সহজেই ক্রেতাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে। অপরদিকে খাদ্য মূল্য যখন হ্রাস পেতে থাকে তখন খুচরা মূল্য পাইকারী মূল্যের সমহারে হ্রাস পায় না কেননা এক্ষেত্রে বিক্রেতারা উচ্চ মূল্য ধান ক্রয় করার ফলে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল তা উচ্চ খুচরা মূল্য বজায় রাখার মাধ্যমে কিছুটা পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে (Deb *et al.* 2009b)।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার উপর মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব

২০০৭-২০০৮ সালে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির ফলে মানুষের প্রকৃত আয় কমে গিয়েছিল যা দারিদ্র্য ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির ফলাফল বিশ্লেষণার্থে বেশ কিছু গবেষণাধর্মী কাজ হয়েছে। Rahman *et al.* (2008)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০০৮ এর মার্চ মাসের মধ্যে প্রায় ২৫ লাখ খানা (১.২১ কোটি মানুষ) খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে। Raihan (2008)-এর হিসাব অনুযায়ী ২০০৪-০৬-এর মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার প্রায় স্থির ছিল (৪০ শতাংশ) কিন্তু ২০০৬-০৭ সালে তা প্রায় ২.১ শতাংশ পয়েন্ট (percentage point) বৃদ্ধি পায় এবং ২০০৭-০৮ সালে আরও ৪.৩ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়। FAO/WFP (2008)-এর সমীক্ষা অনুযায়ী খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির প্রভাবে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তাহীন (জনপ্রতি প্রতিদিন ২,১২২ কিলোক্যালরির চেয়ে কম ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করা) মানুষের সংখ্যা ৭৫ লাখ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মোট খাদ্য নিরাপত্তাবিহীন মানুষের সংখ্যা ৬.৫৩ কোটিতে গিয়ে পৌঁছে। এই সমীক্ষা অনুযায়ী, খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির ফলে অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের সংখ্যা ৬৮ লাখ বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ অপুষ্ট মানুষের সংখ্যা ২.৭৯ কোটি থেকে ৩.৪৭ কোটিতে পৌঁছে)। খাদ্য নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়া এসকল মানুষদের অধিকাংশকেই (৯০ শতাংশ) চরমভাবে খাদ্য নিরাপত্তাহীনদের (জনপ্রতি দৈনিক ১০৮৫ কিলোক্যালরির চেয়ে কম ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করা) মাঝে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।[৮]

সারণি ৫

বাংলাদেশে কৃষি শ্রমিকের চালের সমতুল্য গড় দৈনিক মজুরি (খাদ্য ব্যতীত): ১৯৯০/৯১ থেকে ২০০৯/১০

বৎসর	মোটা চালের পাইকারী মূল্য (কেজি)	মজুরির হার	
		(টাকা/দিন)	চালের সমতুল্য মজুরির (কেজি/দিন)
১৯৯০/৯১	১০.৫৯	৩৭.১৩	৩.৫১
১৯৯১/৯২	১১.০৮	৪০.০০	৩.৬১
১৯৯২/৯৩	৯.৪২	৪১.৫০	৪.৪১
১৯৯৩/৯৪	৯.৬০	৪২.৭৫	৪.৪৫
১৯৯৪/৯৫	১২.২৮	৪৪.২০	৩.৬০
১৯৯৫/৯৬	১২.৫৮	৪৬.০০	৩.৬৬
১৯৯৬/৯৭	১০.৮৭	৪৭.০০	৪.৩২
১৯৯৭/৯৮	১২.০৯	৪৯.০০	৪.০৫
১৯৯৮/৯৯	১৩.৯৮	৫২.০০	৩.৭২
১৯৯৯/০০	১২.৩৬	৫৫.০০	৪.৪৫
২০০০/০১	১১.৬২	৫৭.৮১	৪.৯৮
২০০০/০২	১২.৭১	৬১.০৮	৪.৮১
২০০২/০৩	১৩.৩১	৭৪.৫৬	৫.৬০
২০০৩/০৪	১৩.০৭	৭৫.৪২	৫.৭৭
২০০৪/০৫	১৪.৭৪	৭৮.৬৭	৫.৩৪
২০০৫/০৬	১৫.৮০	৮৯.৮৩	৫.৬৯
২০০৬/০৭	১৭.০১	১০১.০৮	৫.৯৫
২০০৭/০৮	২৫.০০	১২১.৬৭	৪.৯৬
২০০৮/০৯	২৫.০০	১২৫.৭৯	৫.০৩
২০০৯/১০*	২২.৮০	১২৯.৫০	৫.৬৮

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, মাসিক বুলেটিন।

নোট: ২০০৯ এর জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসের গড়।

[৮] ২০০৭-০৮ সালের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে wasting এর হার (চরম অপুষ্টি) দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল (Matin *et al.* 2009)।

চালের মূল্য, কৃষি শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি এবং চালের হিসেবে প্রকৃত মজুরি (rice equivalent) এই তিনটি চলকের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৯০-৯১ সালে একজন কৃষি শ্রমিক তার দৈনিক মজুরি দিয়ে ৩.৫ কেজি চাল ক্রয় করতে পারত; এটি ক্রমশ: বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬-০৭ সালে ৫.৯ কেজি গিয়ে পৌঁছে (সারণি ৫)। অর্থাৎ উল্লেখিত সময়ে কৃষি শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি প্রায় ১.৭ গুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু চালের মূল্য বৃদ্ধির ফলে ২০০৭-০৮ সাল নাগাদ চালের হিসেবে প্রকৃত মজুরি কমে দিন প্রতি প্রায় ৫ কেজি হয়ে যায়। Sulaiman *et al.* (2009)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী ২০০৮ সালের প্রথমার্ধে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি ভোগ এবং পুষ্টি উভয়ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। গ্রামাঞ্চলে ২০০৬ সালে সমগ্র খাদ্য ক্রয়ে চালের অংশ ছিল শতকরা ৪৫ ভাগ; চালের মূল্য বৃদ্ধির ফলে ২০০৮ সালে এই অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫১ শতাংশে উন্নীত হয়। এই সময়কালে শহরাঞ্চলে চালের পিছনে ব্যয় ২৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ শতাংশে পৌঁছে। তবে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি বিভিন্ন আয়ের মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল। চালের পিছনে ব্যয় বৃদ্ধি সমাজের দরিদ্রতম গোষ্ঠীকে যেমন প্রভাবিত করেছিল (২০০৬ সালে চালের পেছনে ব্যয় হতো মোট খাদ্য ব্যয়ের ৪৯ শতাংশ এবং ২০০৮ সালে এই ব্যয়ের অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬২ শতাংশ হয়ে যায়), ধনীদের তেমন ভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি (২০০৬ সালে সমগ্র খাদ্য ব্যয়ের মধ্যে চালের জন্য ব্যয়িত অংশ ছিল শতকরা ৩৭ ভাগ যা ২০০৮ সালে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৩৯ ভাগে পরিণত হয়)। চালের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সমাজের দরিদ্রতম গোষ্ঠী তাদের খাদ্য তালিকা থেকে কিছু পুষ্টিদায়ক খাদ্যকে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছিল। বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় যে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ যে খাদ্যদ্রব্যটি ভোগ করা হয় তা হলো মাছ। ২০০৬ সালের তুলনায় ২০০৮ সালে মাছের ভোগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। এসময়কালে ডালের ভোগের পরিমাণও হ্রাস পেয়েছিল। ডাল ও মাছের পরিবর্তে তুলনামূলকভাবে সস্তা শাক-সবজি ভোগের পরিমাণ এসময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমিষের ভোগের পরিমাণ (প্রধানত মাছ এবং ডাল) যা সমাজের দরিদ্রতম গোষ্ঠীর জন্য পূর্বেই অনেক কম ছিল, চালের মূল্য বৃদ্ধির ফলে ২০০৮ সালে তা আরও কমে গিয়েছিল।[৯]

Sulaiman *et al.* (2009)-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির ফলে খাদ্য তালিকায় যে পরিবর্তন হয় তা শিশুদের, বিশেষত ০-৬ মাস বয়সী শিশু এবং ২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের পুষ্টির উপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল (সারণি ৬)। ০-৬ মাস বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলেছিল গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টির উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে। অপরদিকে ২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি অনেকটা সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল খাদ্যের তালিকায় পুষ্টিগত মান হ্রাসের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, প্রবন্ধটিতে আরও বলা হয় যে, গবেষকগণ যখন মায়েদের কাছে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি এবং অপুষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য বের হয়ে আসে। মায়েরা গবেষকদের জানান যে, খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির পূর্বে তারা তাদের শিশুদের জন্য খিচুড়ী কিংবা দুধ, কলা ও ভাতের সমন্বয়ে পৃথক শিশুখাদ্য প্রস্তুত করতেন। কিন্তু

[৯]ধানের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষি ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরিও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু মূল্য ও মজুরির এই সমন্বয়সাধন ছিল আংশিক। ২০০৭-০৮ সালে খাদ্য মূল্য ৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু কৃষি মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ৩৫ শতাংশ, এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রে নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। শহরাঞ্চলে রিকসাচালক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ভাড়া এবং মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিস্থিতির সাথে কিছুটা মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নিম্ন মজুরি পাওয়া পোশাক শ্রমিক এবং নির্ধারিত আয়ের মানুষেরা খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগস্ত হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে মোটা চালের মূল্য হ্রাসের ফলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে (Hossain and Deb 2009)।

খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে এরূপ পৃথক খাদ্য প্রস্তুত করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না এবং শিশুরা পরিবারের অন্যান্যদের জন্য প্রস্তুতকৃত খাদ্য থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাকত যা কিনা পরিমাণ এবং পুষ্টিমান উভয়দিক দিয়েই পূর্বের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল।

সারণি ৬
বয়সভেদে অপুষ্টির পরিমাণ

বয়স	বয়সের তুলনায় কম ওজন (underweight) (মাঝারি-চরম)		বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা (stunting) (মাঝারি-চরম)		ক্ষীণ দেহ (wasting) (মাঝারি-চরম)	
	২০০৬	২০০৮	২০০৬	২০০৮	২০০৬	২০০৮
	১৩.৩	২৪.৪	১১.৭	২৪.৪	৩.৩	২৮.৯
	২৫.৮	২৯.৮	২৩.০	৩১.৯	১৪.৫	১৭.০
১২-২৩ মাস	৪৬.৩	৪৮.৪	৫৫.৭	৬২.৫	১৪.৬	১৯.৮
২৪-৫৯ মাস	৪৮.১	৫৫.৫	৫৩.৮	৬২.৯	১৪.৪	২১.১
সকল বয়সের জন্য	৪২.৪	৪৭.৯	৪৭.৫	৫৫.৪	১৩.৫	২১.১
নমুনা সংখ্যা	৬৬১	৪৩৫	৬৬১	৪৩৫	৬৬১	৪৩৫

উৎস: Sulaiman *et al.* (2009)।

৩। খাদ্য নিরাপত্তা : প্রেক্ষিত বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ

৩.১। খাদ্যশস্য উৎপাদনে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে পানির আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা দেখা যায়। সাধারণত নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়কালকে বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুম হিসেবে ধরা হয়। এসময়ে সকল প্রাকৃতিক উৎসের পানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, নদী-নালা, খাল-বিল শুকিয়ে যায় এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। এই মৌসুমেই সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির চাহিদা সর্বোচ্চ থাকে। বিগত তিন দশক ধরে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে কৃষি ও অন্যান্য কাজে ভূগর্ভস্থ পানির উপর এই নির্ভরশীলতা কতদিন পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব এ বিষয়ে গবেষকগণ ক্রমশ সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। একারণে শুষ্ক মৌসুমে পানির যোগান ও চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

শুষ্ক মৌসুমে ভূ-উপরিস্থিত পানির প্রাপ্যতা

ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকে এবং এসময়ে কৃষিক্ষেত্রে পানির চাহিদা পূরণের জন্য অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করতে হয়। এ মৌসুমে নদী-নালাতেও পানির প্রবাহ কম থাকে। খরা (drought) দেখা দিলে পানি স্বল্পতার এই সমস্যাটি আরও প্রকট হয়ে উঠে। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ২০ শতাংশ এলাকা খরাক্রান্ত হয়েছে। এছাড়া খরার সময় অগভীর নলকূপ ও লো-লিফট-পাম্প দ্বারা উত্তোলিত পানির উপর নির্ভরশীল এলাকাসমূহ এবং প্রথাগত (traditional) সেচ ব্যবস্থা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বন্যায় ফসলের ক্ষতির পরিমাণের মতো খরার ফলে ক্ষতির পরিমাণ সহজে নির্ণয় করা যায় না। তবে বাংলাদেশে

খরার ফলে ফসলের ক্ষতির পরিমাণ সাধারণত বন্যার ফলে ক্ষতির পরিমাণের চেয়ে বেশি বলে মনে করা হয়।[১০]

ফারাক্কা বাঁধ হওয়ার পর গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহের পরিবর্তন হয়েছে। সাম্প্রতিককালে তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, মার্চ মাসে গঙ্গা নদীতে পানি প্রবাহ বাঁধ হওয়ার পূর্বের অবস্থার তুলনায় শতকরা প্রায় ৫৭ ভাগ কম থাকে। অক্টোবর মাস থেকে পানি প্রবাহ হ্রাস পাওয়া শুরু করে এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস নাগাদ তা সর্বনিম্ন অবস্থায় পৌঁছায়। এই অবস্থা প্রায় জুন মাস পর্যন্ত বিরাজ করে। পানি প্রবাহের এরূপ হ্রাস পাওয়া নদীগতিপথ (river morphology), লবণাক্ততা এবং পরিবেশের উপর অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলে। অভ্যন্তরীণ নদীসমূহের ক্ষেত্রে প্রবাহ হ্রাস পাওয়ার দরুন লো-লিফট-পাম্প দ্বারা পরিচালিত সেচ ব্যবস্থা, প্রথাগত সেচ ব্যবস্থা এবং মৎস্য সম্পদের বহুবিধ ক্ষতি হয়। ১৯৯৬ সালের পানি চুক্তি অনুযায়ী শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ যদি ৭০,০০০ কিউসেকের কম থাকে তাহলে ভারত বাংলাদেশকে কমপক্ষে ৩৫,০০০ কিউসেক কিংবা ফারাক্কায় পানি প্রবাহের ৫০ শতাংশ পানি দেওয়ার কথা। এই চুক্তির শর্ত রক্ষিত হলে শুষ্ক মৌসুমে ভূ-উপরিস্থিত পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং একটি নতুন ভারসাম্যের সৃষ্টি হবে। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে একটি সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সরকার গঙ্গা নদীতে একটি বাঁধ নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই-বাছাই করে দেখছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হচ্ছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানির উন্নয়ন সম্ভাবনা

ভূ-গর্ভস্থ পানির উন্নয়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত দুটি বিষয় রয়েছে। প্রথম বিষয়টি হলো দেশে কি পরিমাণ ভূ-গর্ভস্থ পানি রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের নলকূপ ব্যবহার করে সেচ ব্যবস্থা কতটা সম্প্রসারণ করা সম্ভব? দ্বিতীয়ত, ভূ-গর্ভস্থ পানির বেশি ব্যবহারের ফলেই কি আর্সেনিক সমস্যা প্রকট হয়েছে এবং আর্সেনিকমুক্ত পর্যাপ্ত পানি নিশ্চিতকরণের জন্য কি ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাধ্যমে সেচ হ্রাস করা প্রয়োজন?

প্রথম প্রশ্নের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য যে সকল গবেষণা করা হয়েছে সেগুলোর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ভেদে ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ১৯৯১ সালের Master Plan Organization (MPO) কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষাটি ভূ-গর্ভস্থ পানির মূল্যায়নের জন্য সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা বলে মনে করা হয়। পূর্বের সমীক্ষাসমূহের সীমাবদ্ধতাকে মাথায় রেখে MPO একটি সমন্বিত পানির ভারসাম্য মডেল (integrated water balance model) তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। MPO-এর হিসাব অনুযায়ী সম্ভাব্য (potential) রিচার্জের পরিমাণ ৭২,১০০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার, ব্যবহারযোগ্য (usable) রিচার্জের পরিমাণ ৫৪,১০০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার এবং লভ্য (available) রিচার্জের পরিমাণ ২১,১০০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার। এসকল তথ্য বিশ্লেষণ করে কি পরিমাণ ভূ-গর্ভস্থ পানি সেচ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব তা নির্ধারিত হওয়া উচিত। কি পরিমাণ পানি উত্তোলন করা হবে তা নির্ভর করে পানি উত্তোলন করতে কতটুকু ব্যয় হবে তার উপর। অর্থনৈতিক

[১০] ১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৮৩-৮৪ সময়কালে ধানের উৎপাদনের উপর খরা ও বন্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, সার্বিকভাবে খাদ্য উৎপাদনের উপর খরার বিরূপ প্রভাব বন্যার বিরূপ প্রভাবের চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর (Ahmed and Bernard 1989)।

বিশ্লেষণ নির্ধারণ করবে সেচের কাজে কোন উৎস হতে পানি ব্যবহার হবে (ভূ-গর্ভস্থ পানি অথবা ভূ-উপরিস্থিত পানি), কি পরিমাণ ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা হবে এবং কি ধরনের উত্তোলন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরকে স্থায়ীভাবে না কমিয়ে (groundwater mining) কি পরিমাণ পানি উত্তোলন করা যায় তা নিরূপন করা সম্ভব। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ভূ-গর্ভস্থ পানি সেচের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল এবং অদূর ভবিষ্যতেও এই নির্ভরশীলতা বজায় থাকবে। সেচের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণও এই ধারণা প্রদান করে যে, ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে সেচের ব্যবস্থা করাটাই বর্তমানে বাংলাদেশের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হবে। ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের সাথে আর্সেনিক সংক্রামনের সরাসরি সম্পর্ক এখনও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। এ সমস্যার পিছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে এবং শুধুমাত্র বিস্তারিত গবেষণা এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

শুষ্ক মৌসুমে পানির চাহিদা

বাংলাদেশে পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার হয় সেচ কাজে যা ১৯৭০ সালের পরবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (সংযুক্তি সারণি-৩)। এই ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায় যতদিন পর্যন্ত না সম্ভাব্য রিচার্জের পরিমাণ নি:শেষ হয়ে যায়। একই সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শহরায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য পানির চাহিদা ধীরে ধীরে বাড়বে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে এবং শিল্পক্ষেত্রে পানি ব্যবহার এখন কম হলেও ভবিষ্যতে এসকল ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যও পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সুরক্ষিত রাখতে হবে। এছাড়া ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য সুপেয় পানির সরবরাহও সুনিশ্চিত করতে হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎসের অনেকাংশ দূষিত হয়ে পড়েছে। এসকল সমস্যার সমাধান খোঁজার প্রচেষ্টা চলছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানির প্রবাহ যখন কমে যায় তখন লবণাক্ততার সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। শুষ্ক মৌসুমে যখন ভূ-উপরিস্থিত পানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায় তখন উপকূল অঞ্চলের নদী-নালা, ভূমি এমনকি ভূ-গর্ভস্থ পানিতেও লবণাক্ততা দেখা দেয়।

শুষ্ক মৌসুমে পানি ব্যবস্থাপনার আর একটি সমস্যা হলো নাব্যতা হ্রাস পাওয়া। নাব্যতা কমে যাওয়ায় নদীপথে চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় এবং মৎস্য সম্পদও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাছ বাংলাদেশে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে আমিষ জাতীয় খাদ্যের অন্যতম প্রধান উৎস এবং মৎস্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এছাড়াও নদীপথে নৌযান চলাচলে একটি ন্যূনতম গভীরতা (minimum depth of flow) প্রয়োজন যা শুষ্ক মৌসুমে বিঘ্নিত হয়।

৩.২। আবাদযোগ্য জমির ক্রমহ্রাস

বাংলাদেশ একটি ভূমিস্বল্প দেশ যেখানে মাথাপিছু আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ মাত্র ১৫ শতক। পাশাপাশি প্রতিবছর প্রায় ১ শতাংশ হারে কৃষি জমি অকৃষিজ জমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। যদি এই হারে কৃষি জমি অকৃষিজ কাজে ব্যবহার হওয়া অব্যাহত থাকে তাহলে তা নিশ্চিতভাবেই কৃষিখাতের জন্য একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিবে এবং ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলবে। কৃষি জমির এরূপ অকৃষি কাজে ব্যবহার হওয়ার বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে কি কি কারণে এধরনের রূপান্তর ঘটছে তা খতিয়ে দেখা উচিত। এক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে পরিচালিত

বিভিন্ন কৃষিশুমারী ও জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের নিরীখে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ১৯৮৪ এবং ১৯৯৬ সালের আবাদযোগ্য জমির পরিসংখ্যান তুলনা করে দেখা যায় যে, ১৯৮৪ সালে মোট আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ ছিল ২.০২ কোটি একর এবং ১৯৯৬ সালে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ১.৭৮ কোটি একর। এই ১২ বছরে মোট আবাদযোগ্য ভূমি ২৪ লাখ একর অর্থাৎ প্রায় ১২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অন্য কথায়, ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন অকৃষিজ কাজে যেমন- গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি কাজে ব্যবহার হওয়ার কারণে প্রতিবছর প্রায় ১ শতাংশ হারে অর্থাৎ প্রতি বছর প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর কৃষি জমি হ্রাস পেয়েছে। এই পরিসংখ্যান বিভিন্ন গবেষণা কাজে উল্লেখিত হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রাক্কলনও করা হয়েছে (রহমান ২০১২)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ১৯৯৬ সালের পরবর্তী সময়ে কৃষি জমি হ্রাস পাওয়ার এই ধারা কি অব্যাহত রয়েছে এবং যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে তাহলে কি একই হারে তা হ্রাস পাচ্ছে? ২০০৮ সালের কৃষি শুমারীর পরিসংখ্যান হতে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। সারণি ৭-এ এসংক্রান্ত কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো।

সারণি ৭
গ্রামীণ অঞ্চলে জমি ব্যবহারের ধরনের পরিবর্তন : ১৯৮৪-২০০৮

গ্রামীণ অঞ্চলে জমির ব্যবহার	কৃষি শুমারী			জমির পরিবর্তন ('০০০ একর)		
	১৯৮৩-৮৪ ('০০০ একর)	১৯৯৬ ('০০০ একর)	২০০৮ ('০০০ একর)	১৯৮৪ থেকে ২০০৮-এর মধ্যবর্তী সময়ে	১৯৮৪ থেকে ১৯৯৬-এর মধ্যবর্তী সময়ে	১৯৯৬ থেকে ২০০৮-এর মধ্যবর্তী সময়ে
সকল কৃষি হোল্ডিং এর আওতাধীন জমির পরিমাণ (operated area)	২২,৬৭৮	১৯,৯৫৭	২১,৯৪৫	-৭৩৩ (-৩.২৩%)	-২৭২১ (-১২.০০)	+১৯৯৮ (+৯.৯৬%)
সকল কৃষি হোল্ডিং এর আওতাধীন বসতবাড়ীর জমির পরিমাণ (homestead area)	৯৬৬	১,৩১৮	১,৯৯৬	+১০৩০ (১০৬.৬২%)	+৩৫২ (৩৬.৪৪%)	+৬৭৮ (৫১.৪৪%)
সকল কৃষি হোল্ডিং এর আওতাধীন চাষকৃত জমির পরিমাণ (cultivated area)	২০,১৫৭	১৭,৭৭১	১৮,৮১৫	-১৩৪২ (-৬.৬৬%)	-২৩৮৬ (-১১.৮৪%)	+১০৪৪ (+৫.৮৭%)

উৎস: রহমান (২০১২), কৃষি শুমারী (২০০৮) এবং লেখকের গণনা।
নোট: বন্ধনীতে পরিবর্তনের শতকরা হার উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৯৬ এবং ২০০৮ সালের কৃষি শুমারী হতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান তুলনা করে দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালে যেখানে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ১.৭৮ কোটি একর ২০০৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১.৮৮ কোটি একরে পৌঁছে। অর্থাৎ ১২ বছরে ১০ লাখ একর আবাদী জমি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কিনা প্রায় ৬ শতাংশ (অর্থাৎ প্রতি বছর ০.৫ শতাংশ হারে আবাদী জমি বৃদ্ধি পেয়েছে)। পূর্বের দুটি কৃষি শুমারীর তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে কৃষি জমি হ্রাসের যে আশঙ্কা করা হয়েছিল, ২০০৮ সালের কৃষি শুমারী সে ধারণার বিপরীত তথ্য প্রদান করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০১০) এরূপ পরিবর্তনের জন্য নিম্নলিখিত কারণসমূহ উল্লেখ করেছে:

- পতিত জমি ও জলাশয় সমূহের কৃষি কাজে ব্যবহৃত হওয়া।
- ২০০৮ সালের পরিবর্তিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বৃহত্তর এলাকা গ্রামাঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হওয়া এবং তার ফলে আবাদী জমির পরিমাণও বৃদ্ধি পাওয়া।

২০০৮ সালের কৃষি শুমারীতে গ্রামাঞ্চলের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হওয়ায়, ২০০৮ সালের পরিসংখ্যান এর সাথে ১৯৯৬-এর পরিসংখ্যান তুলনীয় নয়। ফলে দুই শুমারীর মধ্যবর্তী সময়ে কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৯৮৪ এবং ২০০৮-এর কৃষি শুমারীর তথ্য অনুযায়ী ২৪ বছরে আবাদী জমির পরিমাণ ১.৩৪ মিলিয়ন একর হ্রাস পেয়েছে (১৯৮৪ এবং ২০০৮ সালে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০.১৬ মিলিয়ন একর ও ১৮.৮২ মিলিয়ন একর)। অর্থাৎ প্রতি বছর ০.২৮ শতাংশ হারে কৃষি জমি কমেছে। এই পরিসংখ্যান সাম্প্রতিককালে Quasem (2011)-এর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কৃষি জমি হ্রাসের হারের (০.৫৬ শতাংশ) সাথে তুলনা করা যায়।[১১] কৃষি জমি হ্রাসের এই আশঙ্কাজনক হারকে রোধ করতে নিম্নলিখিত নীতি পরামর্শসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে-

- অকৃষি খাতের তুলনায় করে কৃষি খাতকে আরও লাভজনক করে তোলার প্রচেষ্টা।
- কৃষি জমিকে অকৃষি কাজে ব্যবহারের উপর "বিশেষ বিক্রয় কর" আরোপ।
- কৃষি জমিকে অন্যান্য কাজে ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে কৃষি জমির হস্তান্তর বা বিক্রয়ের উপর বিশেষ ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ।
- সঠিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন (land use planning), বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে।[১২]

কৃষি জমির দ্রুত রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট ওয়াকিবহাল আছে এবং খাদ্য উৎপাদন, গ্রামীণ অঞ্চলে গৃহ নির্মাণ, শহরায়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের দিকে নজর রেখে সরকার জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা (২০০১) প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমির সঠিক ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং গৃহনির্মাণ, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, অন্যান্য নির্মাণ প্রভৃতি কাজে সতর্কতার সাথে ভূমি ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছে। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালার (২০০১) বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য ভূমি আইন (Land Act) প্রণয়ন করা হচ্ছে। কৃষি জমির রূপান্তর রোধে ভূমি আইন প্রণয়ন ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তবে কৃষি জমির অকৃষি খাতে রূপান্তরিত হওয়া রোধের দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে উন্নতমানের চাষাবাদ কৌশল অবলম্বন, সঠিকভাবে সার, সেচের ব্যবহার, কৃষি কাজে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতির মাধ্যমে ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সেচ ব্যবস্থাপনা, আবাদী জমির ক্রমহ্রাস প্রভৃতি কারণ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনও সাম্প্রতিককালে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

---

[১১] Quasem (2011) ২০০১-২০০৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কৃষি জমির অকৃষি কাজে ব্যবহার সংক্রান্ত একটি গবেষণা করেন। বাংলাদেশের ৬টি বিভাগের ২৪টি গ্রামের উপর পরিচালিত এই জরিপ থেকে দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগে কৃষি জমির অকৃষি কাজে ব্যবহারের রূপান্তরের হার সবচেয়ে বেশি (১.৪৫ শতাংশ) এবং খুলনা বিভাগে সবচেয়ে কম (০.২৬ শতাংশ)।

[১২] গ্রামীণ অঞ্চলে কৃষি জমির গৃহনির্মাণ কাজে ব্যবহার হওয়ার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে, কেননা ১৯৯৬-২০০৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ৬.৮ লাখ একর কৃষি জমি গৃহনির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, যা ১৯৮৪-৯৬ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ (৩.৫ লাখ একর জমি)।

৪। খাদ্য নিরাপত্তা : প্রেক্ষিত সম্ভাবনা

৪.১। খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীলতা

বাংলাদেশে বার্ষিক এবং মৌসুম ভেদে, উভয় ক্ষেত্রেই খাদ্যশস্যের মূল্য ওঠানামা লক্ষ করা যায়।[১৩] বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সাধারণত বার্ষিক মূল্য ওঠানামা করে এবং এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারিভাবে খাদ্য আমদানির মাধ্যমে মূল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা করা হয়। বিভিন্ন মৌসুমে বিশেষত আমন ও বোরো মৌসুমে ধানের ফলনের পার্থক্যের কারণে মৌসুমী ভেদে মূল্য ওঠানামা করে। মৌসুমী মূল্য পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার সাধারণত দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে: (ক) আভ্যন্তরীণভাবে ধান-চাল সংগ্রহের মাধ্যমে সরকার একটি ন্যূনতম মূল্য বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং (খ) খোলা বাজারে চাল বিক্রয় কর্মসূচির মাধ্যমে চালের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়া থেকে ভোক্তাদের সুরক্ষা প্রদানের কাজ করে থাকে। এই দুই ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে জাতীয় বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করা হয়। তাই এরূপ ব্যয়বহুল কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বে মূল্য পরিবর্তনের সঠিক কারণ এবং তার ফলাফল নির্ধারণ করে তদানুযায়ী কর্মসূচি প্রণয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ (Ahmed *et al.* 2010)।

খাদ্যনীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো খাদ্য মূল্য স্থিতিশীল রাখা। উৎপাদক এবং ভোক্তা, বিশেষত দরিদ্র শ্রেণির ভোক্তাদের জন্য খাদ্য মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দরিদ্র পরিবার যারা তাদের আয়ের প্রায় ৭০ শতাংশ খাদ্যশস্য ক্রয়ে ব্যয় করে থাকে, খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি তাদের প্রকৃত আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়। একই সাথে খাদ্যমূল্যের অস্থিতিশীলতা কৃষকের অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দেয় এবং কৃষিখাতে বেসরকারি বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে। উৎপাদক ও ভোক্তা স্বার্থের এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের সমাধান বাণিজ্য উদারীকরণ এবং একটি সুষ্ঠু উৎপাদন ও দক্ষ বাজারজাতকরণের পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্ভব (World Bank 1999)। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, খাদ্যশস্যের মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য খাদ্যশস্য আমদানিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ১৯৯০ সালের প্রথমার্ধে বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্য আমদানি করা শুরু হয় এবং এর ফলস্বরূপ ১৯৯৪-৯৫, ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন কম হওয়া সত্ত্বেও বাজারে খাদ্যের যোগান এবং মূল্য স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু বেসরকারিভাবে খাদ্য আমদানির এই সাফল্য খাদ্য বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারি হস্তক্ষেপ এবং সরকারিভাবে খাদ্য মজুদকরণের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয় না। যেসব বছর বিশ্ববাজারেও খাদ্যের মূল্য চড়া থাকে (যেমন, ২০০৭ ও ২০০৮ সালে ছিল) সেসময় সরকারিভাবে আমদানিকৃত খাদ্য ভর্তুকি মূল্যে বাজারে সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য কমপক্ষে তিন মাসের বিতরণের জন্য সমপরিমাণ খাদ্য সরকারি মজুদ থাকা দরকার।

---

[১৩]সংযুক্তি সারণি ৪-এ চালের বার্ষিক মূল্য পরিবর্তনের ধারা তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন হিসাব থেকে দেখা গেছে যে, সত্তর দশকের তুলনায় আশির দশকে চালের বার্ষিক মূল্য অনেক বেশি স্থিতিশীল ছিল কিন্তু নব্বইয়ের দশকে চালের মূল্য পুনরায় অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে যা পরবর্তী দশকেও লক্ষ করা যায়। সংযুক্তি সারণি ৫ থেকে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় আশি এবং নব্বইয়ের দশকে চালের মৌসুমী মূল্যের বিস্তার (seasonal price spread) অনেক কমে আসে (প্রায় অর্ধেকেরও কম)। আউস ও আমনের তুলনায় বোরোর অধিক উৎপাদন চালের মূল্যের মৌসুমী পরিবর্তনের প্রধান কারণ।

চালের বাজারে মূল্যের অস্থিতিশীলতার অন্যতম প্রধান কারণ চাল রপ্তানির সুযোগের অভাব। পরপর তিন বছর ধানের বাম্পার ফলনের (১৯৯৬ সালে বোরো, ১৯৯৬/৯৭ সালে আমন এবং ১৯৯৭ সালে বোরো) ফলে আভ্যন্তরীণ বাজারে চালের মূল্য রপ্তানি সমতা মূল্যের (export parity price) নিচে নেমে যাওয়ার পরও বাংলাদেশ থেকে চাল রপ্তানি করা সম্ভব হয়নি। এজন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যিক যোগসূত্রের এবং বাংলাদেশী চালের জন্য আন্তর্জাতিক মান যাচাইকরণ ব্যবস্থার (international grading facilities) অভাব বহুলাংশে দায়ী।[১৪]

চাল রপ্তানির বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বাম্পার ফলনের পরবর্তী সময়ে আভ্যন্তরীণ বাজারে চালের মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং কৃষকদের প্রণোদনা প্রদানের জন্য সরকারি পর্যায়ে চাল সংগ্রহ কর্মসূচি (domestic procurement program) গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অবশ্য সঠিক সংগ্রহ মূল্য স্থির করা যার ফলে কৃষক উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ পাবে এবং একই সাথে সরকারি ব্যয়ও হ্রাস পাবে সত্যিকার অর্থেই একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। অতীত গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, সেচকৃত বোরো ধানের ফলন এবং মূল্য সম্পর্কে আগাম ধারণা করা (forecast) বর্ষা মৌসুমে উৎপাদিত আমন ধানের ফলণ এবং মূল্য সম্পর্কে আগাম ধারণা করার চেয়ে সহজ। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তের বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, বোরো ধানের ক্ষেত্রে ১৩ বছরের মধ্যে ৯ বছরই প্রকৃত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার (target) ৮০ শতাংশের বেশি হয়েছিল এবং মাত্র ১ বছর প্রকৃত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশের চেয়ে কম হয়েছিল। অপরপক্ষে আমন ধানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ১৩ বছরের মধ্যে মাত্র ২ বছর প্রকৃত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার ৮০ শতাংশ অতিক্রম করেছে এবং ১৩ বছরের মধ্যে ৮ বছরই গড়ে মাত্র ১৮ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।[১৫]

নব্বই দশকের শেষভাগে চার বছরের মধ্যে তিন বছরই বোরো ধানের সংগ্রহ মূল্য বাজার মূল্যের চেয়ে মাত্রাতিরিক্ত ধার্য করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ সরকারকে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হয় এবং যারা সংগ্রহ কেন্দ্রে (procurement centre) ধান/চাল বিক্রয় করেছিলেন তারা অতিরিক্ত মুনাফা করতে সক্ষম হন। এছাড়া বাজার মূল্যের ও সংগ্রহ মূল্যের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য যে সকল সরকারি কর্মচারীগণ সংগ্রহ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন তাদেরকে দুর্নীতি করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। অতীতে সরকারি সংগ্রহ কর্মসূচির কার্যক্রম অসন্তোষজনক হওয়ার পিছনে নিম্নোক্ত কারণসমূহ উল্লেখ করা যায়: (ক) ভাল ফলনের বছরে (এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্যোগপূর্ণ বছরেও) সরকারি পর্যায়ে অতিরিক্ত খাদ্য আমদানি যা সরকারি গুদামসমূহের স্থান দখল করে রাখে এবং পরবর্তীতে ফলনের সময়ে সরকারি সংগ্রহ কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে দেয়; (খ) কৃষকেরা সরকারি সংগ্রহ কেন্দ্রে সরাসরি পৌঁছাতে পারে না ফলে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বল্পমূল্যে ব্যাপারীগণের নিকট ফসল বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়। IFPRI-BIDS কর্তৃক পরিচালিত একটি জরিপ থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে যে, সংগ্রহকৃত ফসলের উল্লেখযোগ্য অংশই বড় কৃষক ও ব্যাপারীদের থেকে পাওয়া;

[১৪] মূল্য স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে বাণিজ্য নির্ভরশীলতা প্রক্রিয়ায় একটি অসামঞ্জস্য দেখা যায়। উৎপাদন ঘাটতির ক্ষেত্রে আমদানি সমতা মূল্য (import parity price) সর্বোচ্চ মূল্য (ceiling price) হিসেবে বিবেচিত হলেও অধিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির অভাবে রপ্তানি সমতা মূল্য (export parity price) সর্বনিম্ন (floor) মূল্য বলে বিবেচিত হয় না। এক্ষেত্রে কৃষকদের উৎপাদনে প্রণোদনা এবং মূল্য সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারি ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Shahabuddin 2010)।

[১৫] সাম্প্রতিককালেও একই চিত্র দেখা যায়। ২০০০-০৯ সময়ে ১০ বছরের মধ্যে ৮ বছরই বোরো ধানের সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার ৮০ শতাংশ অতিক্রম করেছে। কেবলমাত্র ১ বছর (২০০৭) সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশেরও কম ছিল। অপরদিকে আলোচ্য দশ বছরে মাত্র ২ বছর আমন ধানের সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার ৮০ শতাংশ অতিক্রম করেছিল (Ahmed *et al.* 2010)।

সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় মাঝারি ও ছোট কৃষকদের অংশগ্রহণ খুবই কম (Shahabuddin and Islam 1999)। খাদ্যশস্য সংগ্রহ কর্মসূচিতে ছোট ও মাঝারি কৃষকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সরকারের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

খাদ্যশস্যের সরকারি মজুদ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা

প্রথাগত কল্যাণমুখী অর্থনীতির (traditional welfare economics) তত্ত্ব অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে গ্রহণকৃত সকল কর্মসূচিই প্রকৃতপক্ষে অপচয়ের শামিল; তথাপি অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশই আভ্যন্তরীণ সরবরাহজনিত সমস্যার কারণে সৃষ্ট মূল্যের অস্থিতিশীলতাকে মোকাবেলা করার জন্য কোনো না কোনো ধরনের মূল্য স্থিতিশীলক নীতি (price stabilization policy) অবলম্বন করে থাকে। কেননা বাংলাদেশের মতো অর্থনীতিতে যেখানে দারিদ্র্য এখনও ব্যাপকভাবে বিরাজমান এবং পুঁজিবাজার সম্পূর্ণভাবে বিকশিত নয় সেক্ষেত্রে ক্রেতারা দ্রব্যমূল্য যখন কম থাকে তখন যতটুকু সাশ্রয় করতে সক্ষম হয় পরবর্তীতে মূল্য বৃদ্ধির সময় তা দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে এরূপ ধারণা পোষণ করা অবাস্তব (Shahabuddin 1996)।

বাংলাদেশের খাদ্য বাজারে মজুদের ভূমিকা এবং মূল্য স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে তার ভূমিকা বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে। এসকল গবেষণায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সরকারি মজুদ ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকার আবশ্যিক বিষয়টিও উঠে এসেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারি মজুদের জন্য সর্বোত্তম পরিমাণ (optimal stock) হিসেবে কোনো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই; বিরাজমান অর্থনৈতিক অবস্থার উপর এই মজুদের পরিমাণ নির্ভর করে। বিশেষত সরকারি মজুদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর করলে (খাদ্য ঘাটতির সময়ে আমদানি এবং উদ্বৃত্ত থাকলে রপ্তানি) সরকারি ব্যয় সংকোচনের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে (Goletti 2000)।[১৬]

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (PFDS) মাধ্যমে খাদ্য মজুদ রাখা হয়: (ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জরুরি ত্রাণ সহায়তা প্রদান, (খ) দরিদ্র পরিবার সমূহের মধ্যে খাদ্য বিতরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণ এবং (গ) প্রয়োজনের সময় চালের বাজারের মূল্য স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুদকরণ, ব্যবস্থাপনা ও বিতরণের সমগ্র প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। একারণে সরকার যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য মজুদ না করে তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

সময়ের সাথে সাথে সরকারি খাদ্যশস্য মজুদের পরিমাণ পরিবর্তন হয়েছে এবং একই সাথে বিতরণের চ্যানেলগুলোরও পরিবর্তন ঘটেছে। আশির দশকের শেষভাগে এবং নব্বইয়ের প্রথমার্ধে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বার্ষিক ২১.৬ থেকে ২৯.৭ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হতো এবং অধিকাংশ বিতরণই ঘটত রেশন চ্যানেলের মাধ্যমে। ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ সালে গড় মজুদের পরিমাণ ছিল ১১.৪ লাখ মেট্রিক টন, যা ঐ দুই বছরের গড় মাসিক বিতরণের যথাক্রমে ৬.৭ ও ৫.৪ গুণ। নব্বই দশকের প্রথমদিকে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং দুটি প্রধান রেশন চ্যানেলের (পল্লী রেশনিং চ্যানেল এবং সংবিধিবদ্ধ রেশনিং চ্যানেল) বিলুপ্তি ঘটে। এর পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট বিতরণ ব্যবস্থাসমূহের (targeted distribution) প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ

[১৬] ২০০৭-০৮ সালের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি এবং প্রধান চাল রপ্তানিকারক দেশসমূহের চাল রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ভাবতে বাধ্য করে যে আভ্যন্তরীণ বাজারের মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর করা কতটা যৌক্তিক।

করা হয়। এর ফলে ১৯৯৩/৯৪ থেকে ১৯৯৬/৯৭ এর মধ্যবর্তী সময়ে সরকারি বিতরণের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে গড়ে ১৫.৩ লাখ মেট্রিক টনে পরিণত হয়। একই সাথে সরকারি মজুদের পরিমাণও হ্রাস পায়। এই সময়ে সরকারি মজুদের পরিমাণ ছিল গড়ে বার্ষিক ৫.৭ লাখ মেট্রিক টন থেকে ৯.৫ লাখ মেট্রিক টন। ১৯৯৮ সালের বন্যা পরবর্তী সময়ে সরকারি মজুদের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯/২০০০ সালে বার্ষিক ১৩.৫ লাখ মেট্রিক টন এবং ২০০০-০১ সালে বার্ষিক ৯.৫ লাখ মেট্রিক টনে পরিণত হয় (Dorosh, Shahabuddin and Farid 2004)।[১৭] ২০০১-০২ এর পরবর্তীতে সরকারি মজুদ ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। ২০০১-০২ থেকে ২০০৮-০৯ এর মধ্যবর্তী সময়ে সরকারি মজুদের পরিমাণ ছিল গড়ে বার্ষিক ৮.২ লাখ মেট্রিক টন। এসময়ে মোট বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল ১৪.৩ লাখ মেট্রিক টন।

২০০৮ সালে প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলো কর্তৃক রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা আরোপ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সংকটকালীন সময়ে আমদানির উপর নির্ভরশীলতার ঝুঁকি মূল্যায়নে নীতিনির্ধারক মহলকে বাধ্য করে। অতীতে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে বছরব্যাপী ৭ থেকে ১৫ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুদ রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হতো। ২০০৮-০৯ সালে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, উল্লেখিত নিরাপত্তা মজুদের (security stock) পাশাপাশি বিভিন্ন খাদ্য-ভিত্তিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে বিতরণের জন্য ১৯ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য এবং খোলা বাজারে বিক্রয়ের (Open Market Sale) মাধ্যমে মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য আরও ৫ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুদ রাখা প্রয়োজন।

যদিও সরকারি গুদামসমূহের ধারণ ক্ষমতা ১৭ লাখ মেট্রিক টন কিন্তু কিছু স্থান ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ায় কার্যকর মজুদ ক্ষমতা (effective storage capacity) ১৫ লাখ মেট্রিক টন। এই ধারণক্ষমতা সর্বনিম্ন জাতীয় নিরাপত্তা মজুদের জন্য যথেষ্ট হলেও খাদ্যভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন বা মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য যে অতিরিক্ত মজুদের প্রয়োজন তার জন্য যথেষ্ট নয়। এ সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন গুদাম নির্মাণের পাশাপাশি সরকার কর্তৃক বেসরকারি গুদামসমূহের মজুদ করার ক্ষমতার পরিমাণ নির্ণয় করা, গুদাম মালিকেরা তাদের গুদাম সরকারি শস্য মজুদকরণের কাজে ব্যবহার করতে দিতে এবং গুদাম ইজারা (lease) দিতে কতটা ইচ্ছুক প্রভৃতি বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা উচিত (Ahmed *et al.* 2010)।[১৮]

৪.২। সামগ্রিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনাসমূহ

বিগত দুই দশক ধরে খাদ্যশস্য বিশেষত ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা বিশেষত খাদ্যভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।

---

[১৭]এই বিশাল মজুদ গড়ে ওঠার কারণ ছিল বিলম্বিত আমদানি এবং পরপর কয়েক বছর (১৯৯৯ সালে বোরো ধানে, ১৯৯৯-২০০০ সালে আমন, ২০০০ সালে বোরো এবং ২০০০-০১ সালে আমন ধানে) বাম্পার ফলন হওয়ার ফলে বাজারে চালের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা রোধ করার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহ।

[১৮]সরকারি মজুদের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে লোকবলের প্রয়োজন, সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রণালয় তা সরবরাহ করতে পারবে কিনা সে বিষয়েও লক্ষ রাখতে হবে। সরকারি মজুদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের সময় এসকল প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ের প্রতি অবশ্যই নজর রাখা প্রয়োজন।

খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পিছনে ধানের অবদান সবচেয়ে বেশি যা মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রায় নব্বই শতাংশ। ধানের উৎপাদন প্রবৃদ্ধির অর্জনের ক্ষেত্রে সেচের ব্যবহার, উৎপাদন পর্যায়ে কৃষি উপকরণ, বিশেষভাবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার, উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের ব্যাপক আবাদ প্রভৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এতদসত্ত্বেও খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় বিষয়টি এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রযুক্তিগতভাবে বড় পরিবর্তনের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি ব্যতীত প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখা সম্ভব হবে না।[১৯] এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ এবং শহরায়নের ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ প্রতিবছর এক শতাংশ হারে কমছে এবং একই সাথে শস্য নিবিড়তার (cropping intensity) সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বহু চাষযোগ্য জমি সাগরে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য পানির লভ্যতাও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এসকল সীমাবদ্ধতার দিকে লক্ষ রেখে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য সীমিত পরিমাণ সম্পদ থেকেই উৎপাদনের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করতে হবে।

ধান উৎপাদনের প্রতি অতি মনোযোগের ফলে অন্যান্য খাদ্যশস্য যেমন- ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আমদানি নির্ভর হয়ে পড়ছে। উপরন্ত এসকল খাদ্যসামগ্রী দরিদ্র ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশের মোট চাহিদার ৭০ শতাংশ ডাল এবং ৬৬ শতাংশ ভোজ্যতেল আমদানি করা হয় (Mishra and Hossain 2005)। দরিদ্র জনগোষ্ঠী সাধারণত ভাতের সাথে মাছ ও ডাল খেয়ে থাকে। কিন্তু আবাদী জমিতে বোরোর চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাল এর উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং ডাল এর মূল্যও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।[২০] এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের খাদ্যে ডালের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে এবং এর ক্ষতিকারক প্রভাব তথা অপুষ্টির শিকার হচ্ছে শিশু ও গর্ভবতী মায়েরা।

আর্সেনিক সংক্রামন খাদ্য নিরাপত্তা এবং কৃষি উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তনও খাদ্য নিরাপত্তাকে ঝুঁকির সম্মুখীন করে তুলেছে, বিশেষত সেই সকল এলাকায় যেখানে আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে কৃষিজ সম্পদ বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার (adverse impacts) দেশসমূহের তালিকায় বাংলাদেশের নাম প্রথম সারিতেই আছে।[২১]

এসকল ঝুঁকি মোকাবিলার পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উন্নতমানের বীজ, সার, সেচ ও কৃষি সরঞ্জামাদির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের জন্য গ্রামীণ পর্যায়ে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা প্রভৃতির দিকেও নজর দিতে হবে।[২২] বিভিন্ন ফসলের চাষের তুলনামূলক লাভের

---

[১৯]বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও বিকাশের পিছনে IRRI এবং CIMMYT-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। কিন্তু দু:খজনকভাবে নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসকল আন্তর্জাতিক সহায়তা ক্রমশ কমতে থাকে যা কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

[২০]ডাল একটি রবিশস্য এবং সেচের প্রসারের সাথে সাথে শুষ্ক মৌসুমেও বোরো ধান চাষ সম্ভব হয়েছে এবং তা ডালের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ। এই কারণে ডালের চাষ কমছে এবং বোরো ধানের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

[২১]জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন ১২ লাখ টন হ্রাস পাবে বলে অনুমিত হয় (Deb 2009a)।

[২২]১৯৮০-৮১ সালের তুলনায় ২০০৩-০৪ সালে ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণের বিতরণ ১১ গুণ বৃদ্ধি পেলেও মোট ঋণের পরিমাণে কৃষি ঋণের অংশ অতি নগণ্য। এছাড়া বেশিরভাগ ঋণগ্রহীতাই হচ্ছে মাঝারি ও বৃহৎ কৃষক (Sarkar 2006)।

বিশ্লেষণ, এলাকাভিত্তিক বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিত্তিতে চাষের ধরন নির্ধারণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ প্রভৃতির সুযোগ সুবিধা নির্ণয় এবং সর্বোপরি উৎপাদিত ফসলসমূহের আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে কৃষি বহুমুখীকরণের বিষয়টি পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

খাদ্য সংস্থানের ক্ষেত্রে মানুষের অর্থনৈতিক সামর্থ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শহর ও গ্রামাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়েছে।[২৩] কিন্তু এরপরও অসংখ্য খানা (প্রায় ৫ লাখ) এখনও নিজস্ব উৎপাদন, ক্রয় কিংবা অন্যান্যভাবে তাদের নিজেদের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর আহারের সংস্থান করতে সমর্থ নয়।

২০০৫-এর HIES অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে যে সকল খানার প্রধান কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত (৪৮.২ শতাংশ) এবং যে সকল খানা ভূমিহীন (৬৬.৬ শতাংশ) তাদের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের প্রকোপ বেশি। অপুষ্টির হিসাব ভিত্তিক Direct Calorie Intake (DCI) পদ্ধতিতে নিরূপিত তথ্য অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য (absolute poverty) হ্রাসের (৪৭.৫ শতাংশ থেকে ৪০.৪ শতাংশ) তুলনায় চরম দারিদ্র্য (hardcore poverty)[২৪] (২০ শতাংশ থেকে ১৯.৫ শতাংশ) এবং অতি দরিদ্র (ultra poverty)[২৫] (৮.২ শতাংশ থেকে ৭.৮ শতাংশ) হ্রাসের হার অনেক কম। এ থেকে বোঝা যায় যে, এখনও অনেক মানুষ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রের (vicious cycle) মধ্যে আটকা পড়ে আছে।

এলাকা ভেদে খাদ্য ক্রয়ে মানুষের সামর্থ্যের বিভিন্নতাও লক্ষ করা যায়। CBN পদ্ধতিতে দারিদ্র্যের যে হিসাব করা হয় তা অনুযায়ী দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে প্রায় ৮০ শতাংশ দারিদ্র্যের হ্রাস ঘটেছে প্রধানত ঢাকা ও চট্টগ্রাম এলাকায় (World Bank 2007)। এই তথ্য দিকনির্দেশ করে যে, এলাকা ভিত্তিকভাবে আয়ের অসমতা (regional income disparity) এবং খাদ্যে নিরাপত্তা বিধানকল্পে বিশেষ কৌশল প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া খানা বা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে খাদ্য ভোগে অসমতা লক্ষ করা যায়। দেখা যায় যে, পরিবারের বয়স্ক পুরুষ সদস্যরা সাধারণত নারী ও শিশু সদস্যর চেয়ে খাদ্য ভোগে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে।

বাংলাদেশের প্রায় ৮৫ ভাগ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি কাজের উপর নির্ভর করে থাকে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার দিক দিয়ে গ্রামাঞ্চল অনেকটাই অবহেলিত। এছাড়া শস্য মজুদকরণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং বাজারজাতকরণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে গ্রামাঞ্চল পিছিয়ে রয়েছে। এসকল পশ্চাৎপদতার কথা বিবেচনা করে গ্রামাঞ্চল ও কৃষির উন্নয়নে কৃষি ভিত্তিক শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের[২৬] বিকাশ সাধনই হবে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের অন্যতম হাতিয়ার। এরূপ

---

[২৩] HIES পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮.৯ শতাংশ, ২০০৫ সালে তা কমে ৪০ শতাংশে পৌঁছে এবং ২০১০ সালে তা আরও হ্রাস পেয়ে ৩০.৫ শতাংশ হয়। কিন্তু দারিদ্র্য হ্রাসের সাথে সাথে আয়ের অসমতা বৃদ্ধি পায়। আয়ের অসমতার সূচক "জিনি সহগ" (Gini Coefficient) ১৯৮০ সালে ছিল ০.৩৭ এবং ১৯৯০ সালে ০.৩৯, যা বৃদ্ধি পেয়ে পরবর্তীকালে (২০০০ এবং ২০০৫ সাল) ০.৪৬ এ এসে দাঁড়িয়েছে।

[২৪] যারা দৈনিক ১৮০৫ কিলোক্যালোরির চেয়ে কম খাদ্য গ্রহণ করে।

[২৫] যারা দৈনিক ১৬০০ কিলোক্যালোরির চেয়ে কম খাদ্য গ্রহণ করে।

[২৬] বাংলাদেশে MSME-এর প্রবৃদ্ধির হার বিস্ময়কর। আশির দশকের শেষদিক হতে এই খাত informal খাতের অধিকাংশ শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে এবং জিডিপিতে এই খাতের অবদান প্রায় ২৫ শতাংশ। MSME এর জিডিপিতে মোট অবদানের ৭৭ শতাংশ আসে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতম (micro & small) শিল্প (যেখানে ১-৫ জন শ্রমিক নিয়োজিত থাকে) থেকে।

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে গ্রামাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও ভূমিহীনতার কারণে যে শহরমুখী অভিগম্যতার সৃষ্টি হচ্ছিল যা শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার অন্যতম প্রধান কারণ, সেটিও ক্রমশ কমে আসবে।

বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় পরবর্তী সময়ে সেই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সহায়-সম্পত্তি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। প্রাকৃতিকভাবে দুর্গম জনপদসমূহের (ecologically unfavourable areas) ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এরূপ পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য পারিবারিক ও সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ মোকাবিলাকল্পে সকল স্তরে এবং ঝুঁকি হ্রাসকরণের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ জোরদার করা প্রয়োজন। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন সত্ত্বেও প্রতিবছর আমন চাষের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা এলাকাসমূহে যে মৌসুমী খাদ্য সংকটের সৃষ্টি হয় তা রোধ করার জন্য শুষ্ক মৌসুমে বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধক ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার আরেকটি কারণ হলো খাদ্য মূল্যের অস্থিতিশীলতা ক্রমশ বিশ্বায়নমুখী পরিমন্ডলে বাংলাদেশকে নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তুলেছে। ১৯৯০ সালের পরবর্তী সময়কালে বাংলাদেশ খাদ্যে আত্মনির্ভরতার নীতি (strategy of self-reliance) (অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে আমদানির মাধ্যমে তা পূরণ করা) অনুসরণ করে আসছে। ১৯৯৮ এবং ২০০৪ এর বন্যা পরবর্তী সময়ে এই নীতি অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ২০০৭ এবং ২০০৮ সালে বন্যা, সিডর এবং উচ্চ খাদ্যমূল্য কালীন সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতে বাংলাদেশকে প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

খাদ্যের লভ্যতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য সংস্থানের সামর্থ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি অর্জনের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজন একটি নীতিমালা যার দ্বারা খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অপর যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে তা মোকাবিলা করা যাবে। অতীতের নীতিমালা ও কর্মসূচির বাস্তবায়নের দ্বারা পুষ্টিগত দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি ঘটেনি। খাদ্য ভোগের ধরনের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ধরনের পরিবর্তন চোখে পড়ে না এবং এখনও শতকরা ৯০ ভাগ পুষ্টিই আসে ভাত থেকে। শিশুদের ক্ষেত্রে অপুষ্টির হার বেশ কমলেও (১৯৮৩ সালে অপুষ্টির হার ছিল ৬৮ শতাংশ যা ২০০৫ সালে হ্রাস পেয়ে ৪৭ শতাংশ পৌঁছে) বর্তমানে বিদ্যমান অপুষ্টি হারটিও বিশ্বের অন্যতম উচ্চ অপুষ্টি হারের পর্যায়ে রয়েছে। এখনও ৩০ শতাংশ নারী ও শিশু ভিটামিন "এ" এর অভাবে ভোগে, দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৫০ ভাগ রক্ত-স্বল্পতায় (anemia) আক্রান্ত এবং শতকরা ৩৬ জন নারী ও শিশু আয়োডিন স্বল্পতার শিকার। জীবনের শুরুতেই এসকল "মাইক্রো ও ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট" এর অভাব পরবর্তী জীবনে সূদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে যা মানসিক ও শারীরিক বিকাশ, আয়ুষ্কাল, জ্ঞানার্জন এবং উৎপাদনশীলতাকেও বিভিন্নভাবে আক্রান্ত করে।

বাংলাদেশে অপুষ্টির বিষয়টি শুধুমাত্র দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আয়ের হিসাব অনুযায়ী দরিদ্রতম পঞ্চমাংশের (poorest quantiles) অন্তর্ভুক্ত পরিবারের শিশুদের অপুষ্টির হার (৪৬-৫০ শতাংশ) অধিক হলেও ধনী পরিবারসমূহের শিশুদের ক্ষেত্রে অপুষ্টির এই হার (৩৩ শতাংশ) কম নয় (World Bank 2007)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, দরিদ্র পরিবারসমূহ সামর্থ্যের অভাবে যেখানে পুষ্টিকর

খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না, ধনী পরিবারসমূহ খাদ্যের পিছনে বেশি ব্যয় করলেও তারা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করছে না। ফলে তারাও প্রোটিন, ভিটামিন এ এবং আয়রনের স্বল্পতায় ভুগছে (HKI 2006)।

এসকল বিশ্লেষণ এই ইঙ্গিতই প্রদান করে যে, খাদ্যের লভ্যতা বৃদ্ধি ও খাদ্য সংস্থানের সামর্থ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি সঠিক খাদ্যাভাস, নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি পান এবং সঠিক স্যানিটেশন অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে অপুষ্টির সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে খাদ্যের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পুষ্টির পার্থক্য বহুলাংশে খাদ্যের পরিমাণ, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, শিক্ষা ও চিকিৎসা লাভের সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। বয়স এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে খাদ্য গ্রহণের বৈষম্য দূর করা গেলে পুষ্টির এই পার্থক্য অনেকটাই কমে যাবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

রহমান, রুশিদান ইসলাম (২০১২): স্বাধীনতার চল্লিশ বছর, সাহিত্য প্রকাশ।

Ahmed, et al. (2010): "Income Growth, Safety Nets and Public Food Distribution," paper prepared for Bangladesh Food Security Investment Forum, held on 26-27 May, 2010 organized by the Ministry of Food, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

Ahmed, R. and Andrew Bernard (1989): *Rice Price Fluctuation and an Approach to Price Stabilization in Bangladesh,* Research Report 72, International Food Policy Research Institute, Washington D.C.

BBS (2010): *Census of Agriculture (2008*): National Series, Volume 1, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

——(2011): *Statistical Year Book of Bangladesh (2011):* Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

——(2012): *Report of the Household Income and Expenditure Survey (2010),* Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

Deb, U. (2009a): "Climate Change and Rice Production in Bangladesh: Implications for R and D Strategy," paper presented at the special conference on "Climate Change and Bangladesh Development Strategy: Domestic Tasks and International Cooperation, held at the ICMAB on 2 January and organized by Bangladesh Paribesh Andolon (BAPA) and Bangladesh Environment Network (BEN), Dhaka.

Deb, U. et al. (2009b): "Higher Boro Production for Food Security: An Integrated Strategy," keynote paper presented at the Dialogue on, "Boro Production: Immediate Tasks for Newly Elected Government" held at the CIRDAP Auditorium on 19 January organized by the Centre for Policy Dialogue, Dhaka.

Dorosh, P. and Q. Shahabuddin (1999): "Price Stabilization and Public Foodgrain Distribution: Policy Options to Enhance National Food Security," FMRSP Working Paper, Mimeo.

Dorosh, P., Q. Shahabuddin and N. Farid (2004): 'Price Stabilization and Food Stock Policy' in P. Dorosh et al. (eds.) *The 1998 Floods and Beyond: Towards Comprehensive Food Security in Bangladesh,* The University Press Limited and the International Food Policy Research Institute, Dhaka and Washington, D.C.

FAO (2011): *FAO Annual Report (2011),* Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Goletti, F. (2000): "Price Stabilization and Management of Public Food grain Stock in Bangladesh," in R. Ahmed, S. Haggblade and T.E. Choudhury (eds.), *Out of the Shadow of Famine: Evolving Food Markets and Food Policy in Bangladesh* Johns Hopkins University Press, Bultimore.

HKI (2006): *Bangladesh in Facts and Figures: (2005*), Annual Report of the Nutritional Surveillance Project, Dhaka.

Hossain, M. and U. Deb (2009): "Food Security and Containing Price Escalation: Facts and Implications for Policy," in *Development of Bangladesh with Equity and Justice: Immediate Tasks for the New Government,* Centre for Policy Dialogue, Dhaka

——(2011): "Crop Agriculture and Agrarian Reforms in Bangladesh: Present Status and Future Options," in M.K. Mujeri and S. Alam (eds.), *Background Papers for Sixth Five Year Plan of Bangladesh (2011-2015),* Vol. 2, Economic Sectors, GED, Planning Commission and the Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka

Jabbar, M.A. (2010): *Policy Barriers for Dairy Value Chain Development in Bangladesh with a Focus on the North West Region*, Report prepared for CARE Bangladesh and Unnayan Shamunnay, Dhaka.

Matin I. et al. (2009): *Implications for Human Development – Impacts of Food Price Volatility on Nutrition and Schooling,* BIDS Policy Brief No. 1, Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka.

MoF (): *Bangladesh Economic Review 2011*. Ministry of Finance, GoB.

——(): *Bangladesh Economic Review 2014*. Ministry of Finance, GoB.

Mishra, U. and M. Hossain (2005): *Current Food Security and Challenges: Achieving 2015 MDG Milepost,* Dhaka.

Mujeri, M.K. and B. Sen (2006): "Economic Growth in Bangladesh, 1970-2000," in K.S. Parikh (ed.) *Explaining Growth in South Asia*, Oxford University Press, New Delhi.

Quasem, M.A. (2011): "Conversion of Agricultural Land to Non-Agricultural Use in Bangladesh: Extent and Determinants," *Bangladesh Development Studies*, Vol. 34, No. 1.

Rahman, et al. (2008): "Updating Poverty Estimates in Bangladesh: A Methodological Note," *Bangladesh Economic Outlook,* 1(4).

Raihan, A. (2008): *Recent Inflation in Bangladesh: Trends, Determinants and Impacts on Poverty,* Centre for Policy Dialogue, Dhaka.

Sarkar, R.A. (2006): *Rural Financing and Agricultural Credit in Bangladesh: Futur Development Strategies for Formal Sector Banks,* University Press Limited, Dhaka.

Shahabuddin, Q. (1996) "Public Intervention in Food grain Markets in Bangladesh," in A. Abdullah and A.R. Khan (eds.) *State, Market and Development, Essays in Honour of Rehman Sobhan,* University Press Limited, Dhaka.

Shahabuddin, Q. and K.M. N. Islam (1999): "Domestic Rice Procurement Programme in Bangladesh: An Evaluation," FMRSP Working Paper No. 8, International Food Policy Research Institute, Washington D.C.

Shahabuddin, Q. et al., (2011): "Developing Non-Crop Agriculture in Bangladesh: Present Status and Future Development," in M.K. Mujeri and Shamsul Alam(eds.) *Background Papers for Sixth Five Year Plan of Bangladesh (2011-2015),* Vol. 2, Economic Sectors GED, Planning Commission and the Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka.

Sulaiman, M., M. Parveen and N.C. Das (2009): *The Impact of the Food Price Hike on the Nutritional Status of Woman and Children*, Report commissioned by DFID, Dhaka

World Bank (1999): *Bangladesh: A Proposed Rural Development Strategy,* Mimeo., Dhaka.

——(2007): *To the MDG and Beyond: Accountability and Institutional Innovation in Bangladesh,* Bangladesh Development Series Paper No. 14, WB Office, Dhaka.

সংযুক্তি

সারণি ১

ধানের মোট উৎপাদন, চাষকৃত জমির পরিমাণ এবং ফলনের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির ধানের অংশ

(শতকরা হার)

শস্য	চাষকৃত জমির পরিমাণ (%)				উৎপাদন (%)				ফলন (মেট্রিক টন/হ্যাক্টর)			
	১৯৭২/৭৩-১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১-১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১-১৯৯৯/০০	২০০০/০১-২০০৯/১০	১৯৭২/৭৩-১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১-১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১-১৯৯৯/০০	২০০০/০১-২০০৯/১০	১৯৭২/৭৩-১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১-১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১-১৯৯৯/০০	২০০০/০১-২০০৯/১০
আউশ (স্থানীয়)	২৮.৫৫	২৩.৩১	১২.১৭	৮.২৬	১৮.৮২	১৪.০৪	৬.১৫	২.৬৭	০.৭৯	০.৮৭	০.৯৩	০.৭৭
আউশ (উচ্চ ফলনশীল)	৩.০৩	৪.৫০	৪.১৮	৪.৮৬	৫.৮১	৬.০৪	৪.০৫	৪.৩৬	২.৪৩	১.৯১	১.৭৮	২.১৩
আউশ (মোট)	**৩১.৫৭**	**২৭.৮১**	**১৬.৩৫**	**১৩.১২**	**২৪.৬৩**	**২০.০৮**	**১০.১৯**	**৭.০৩**	**০.৯৪**	**১.০৩**	**১.১৫**	**১.৫৮**
আমন (স্থানীয়)	৫১.৫৬	৪৪.৫০	৩৩.০৭	২১.৭৩	৪৬.৩০	৩৭.২৫	২২.৩৪	১২.৬৫	১.০৯	১.১৯	১.২৪	১.৩৮
আমন (উচ্চ ফলনশীল)	৬.১৮	১১.৪০	২২.৩৯	২৯.৯৪	১১.০০	১৫.৭৬	২৬.০১	৩০.৩২	২.১৬	২.০০	২.১৪	২.৪০
আমন (মোট)	**৫৭.৭৫**	**৫৫.৯০**	**৫৫.৪৭**	**৫১.৬৭**	**৫৭.৩০**	**৫২.৯১**	**৪৮.৩৫**	**৪২.৯৭**	**১.২০**	**১.৩৬**	**১.৬০**	**১.৯৭**
বোরো (স্থানীয়)	৪.৫৩	৩.২৬	২.৪৭	১.৫৪	৪.৮৮	৩.৩৬	১.৯৯	১.২৩	১.২৭	১.৪৫	১.৪৮	১.৯০
বোরো (উচ্চ ফলনশীল)	৬.১৫	১৩.০৩	২৫.৭১	৩৩.৬৭	১৩.২০	২৩.৬৫	৩৯.৪৬	৪৮.৭৭	২.৬১	২.৬৮	২.৮০	৩.৩৯
বোরো (মোট)	**১০.৬৮**	**১৬.২৯**	**২৮.১৯**	**৩৫.২১**	**১৮.০৮**	**২৭.০১**	**৪১.৪৫**	**৫০.০০**	**২.০৪**	**২.৪১**	**২.৬৮**	**৩.১৪**
চাল (স্থানীয়)	**৮৪.৬৫**	**৭১.০৭**	**৪৭.৭১**	**৩৩.২৯**	**৬৯.৯৯**	**৫৪.৫৫**	**৩০.৪৮**	**১৬.৫৬**	**১.০০**	**১.১০**	**১.১৭**	**১.৯০**
চাল (উচ্চ ফলনশীল)	**১৫.৩৫**	**২৮.৯৩**	**৫২.২৯**	**৬৬.৭১**	**৩০.০১**	**৪৫.৪৫**	**৬৯.৫২**	**৮৩.৪৪**	**২.৩৮**	**২.২৮**	**২.৪৪**	**২.৮৭**
চাল (মোট)	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১.২১**	**১.৪৪**	**১.৮৪**	**২.৫৩**

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং লেখকের গণনা।

নোট: Semi-log function ব্যবহার করে প্রবৃদ্ধির হার নিরূপণ করা হয়েছে।

সারণি ২

বাংলাদেশে ধানের জন্য চাষকৃত জমির পরিমাণ, ফলন ও উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হারের ধারা

(শতকরা হার)

শস্য	১৯৭২/৭৩-২০০৯/১০			১৯৯০/৯১-১৯৯৯/০০			২০০০/০১-২০০৪/০৫			২০০৫/০৬-২০০৯/১০		
	জমির পরিমাণ	ফলন	উৎপাদন	জমির পরিমাণ	ফলন	উৎপাদন	জমির পরিমাণ	ফলন	উৎপাদন	জমির পরিমাণ	ফলন	উৎপাদন
আউশ (স্থানীয়)	-৫.৮৬	১.৩৫	-৪.৫১	-৬.৩১	০.১৬	-৬.১৫	-৮.৬২	-০.০৮	-৮.৭০	-১১.৩০	-২.৯০	-১৪.২০
আউশ (উচ্চ ফলনশীল)	২.০৩	-০.৪৩	১.৬০	২.৩৫	০.৯৮	১.৩৭	-০.৬২	-০.৬৫	-১.২৭	৮.১৩	২.৫২	১০.৬৫
আউশ (মোট)	**-৩.৯২**	**১.৮১**	**-২.১১**	**-৪.১২**	**০.৯১**	**-৩.২১**	**-৫.৪৭**	**-০.৪৫**	**-৫.৯২**	**০.৬৩**	**১.২১**	**১.৮৪**
আমন (স্থানীয়)	-২.৯৮	০.৬৩	-২.৩৫	-২.৯৩	-০.৭৫	-৩.৬৮	-৪.৪৩	-১.৮১	-৬.২৪	-৪.৮২	-০.০৬	-৪.৯০
আমন (উচ্চ ফলনশীল)	৬.০৬	০.৫০	৬.৫৬	২.৩০	-০.৪৬	১.৮৪	**১.১৮**	-০.৯০	০.২৮	৪.৩৭	১.৫৭	৫.৯৪
আমন (মোট)	**-০.২০**	**১.৭৫**	**১.৫৫**	**-০.৭৭**	**০.০৮**	**-০.৬৮**	-১.৫১	**-০.৪৯**	**-২.০০**	**০.৯৯**	**২.১৩**	**৩.১২**
বোরো (স্থানীয়)	-৩.৬৫	১.১০	-২.৫৫	-২.৫৩	১.৪০	-১.১৩	-১.১৬	৩.৮২	২.৬৬	-১০.৭৫	-০.৪৩	-১১.১৮
বোরো (উচ্চ ফলনশীল)	৬.৬৪	০.৮৫	৭.৪৯	৪.১৭	১.৮৪	৬.০০	**২.১৬**	১.৭৩	৩.৮৯	৯.০৩	-২.২৮	৬.৭৫
বোরো (মোট)	**৪.৭৫**	**১.৮০**	**৬.৫৫**	**৩.৫৮**	**২.০৮**	**৫.৬৬**	**১.৯৯**	**১.৮৬**	**৩.৮৫**	**৩.৯৫**	**২.৭৪**	**৬.৬৯**
চাল (স্থানীয়)	**-৩.৭৩**	**১.১২**	**-২.৬১**	**-৩.৭৮**	**-০.২২**	**-৪.০০**	**-১.৫১**	**-০.৮৭**	**-২.৩৮**	**-৮.৮২**	**-১.৯৬**	**-১০.৭৮**
চাল (উচ্চ ফলনশীল)	**৫.৭৯**	**০.৭৭**	**৬.৫৬**	**৩.২৪**	**০.৯৯**	**৪.২৩**	**১.৫৮**	**২.২৭**	**৩.৮৫**	**৮.৮৭**	**-০.২১**	**৮.৬৬**
চাল (মোট)	**০.২১**	**২.৫৯**	**২.৮০**	**-০.০৪**	**১.৮১**	**১.৭৭**	**-০.৬৬**	**১.৪৬**	**০.৮০**	**২.১৫**	**২.৯৫**	**৫.১০**

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং লেখকের গণনা।

নোট: Semi-log function ব্যবহার করে প্রবৃদ্ধির হার নিরূপণ করা হয়েছে।

সারণি ৩

সেচ পদ্ধতি ভেদে চাষকৃত জমির পরিমাণের ধারা : ১৯৮২/৮৩-২০১২/১৩

('০০০ হেক্টর)

সেচের মৌসুম/বছর	অগভীর নলকূপ	গভীর নলকূপ	লোলিফট পাম্প ও অন্যান্য	মোট
১৯৮২/৮৩	৩৭১	২৩৪	৯১৮	১৫২৩
১৯৮৩/৮৪	৪৮০	২৬৩	৮৬৬	১৬১০
১৯৮৪/৮৫	৫৮৬	২৮৭	৮৯৮	১৭৭২
১৯৮৫/৮৬	৫৮৬	৩০৪	৮৪৯	১৭৩৯
১৯৮৬/৮৭	৬৩৯	৩১৮	৮৮৩	১৮৪০
১৯৮৭/৮৮	৭৫৩	৩৪৫	৯৬৬	২০৬৪
১৯৮৮/৮৯	৯৪১	৩৮০	১০৫৯	২৩৮০
১৯৮৯/৯০	১০৩৭	৩৮৪	১১৫৬	২৫৭৫
১৯৯০/৯১	১০৭৮	৩৬৫	১৩৪৫	২৬৪৫
১৯৯১/৯২	১২৩৪	৪৩৪	১০৮৬	২৬৭৪
১৯৯২/৯৩	১৩৯২	৪৩৭	১১৩২	২৮২৯
১৯৯৩/৯৪	১৩৮৮	৩৮৯	১১৬১	২৭৬৭
১৯৯৪/৯৫	১৬৩৮	৫০২	১১৬৫	৩৩১০৭
১৯৯৫/৯৬	২০০৪	৫৪০	১১৮১	৩৭৫২
১৯৯৬/৯৭	২১৫৯	৪৭৫	১১২৭	৩৭৬২
১৯৯৭/৯৮	২১৮২	৪৬৫	১১৭২	৩৮৩৩
১৯৯৮/৯৯	২৫২২	৫০৭	১৩১৯	৪৩৪৯
১৯৯৯/০০	২১২৩	৫৩০	৯০৪	৩৫৫৭
২০০০/০১	২২৯৬	৫৩৮	৯৩২	৩৭৬৬
২০০১/০২	২৩৫৫	৫৩০	৯৫৯	৩৮৫০
২০০২/০৩	২৪০৯	৫৮৮	১০১৮	৪০১৮
২০০৩/০৪	২৪২৯	৫৮৯	১০২৫	৪০৪৪
২০০৪/০৫	৩১৬০	৬৫৪	৯৭৩	৪৭৮৭
২০০৫/০৬	৩১২১	৭০১	৯৩৮	৪৭৬০
২০০৬/০৭	৩১৯৬	৭২৫	৯৬১	৪৮৮৩
২০০৭/০৮	৩১৯৭	৭৮৬	১০৬৭	৫০৫০
২০০৮/০৯	৩২৪৫	৭৯০	১০৯২	৫১২৭
২০০৯/১০	৩৩৩৭	৭৭৩	১১৭৭	৫২১৮
২০১০/১১	৩৫০৫	৭১৯	১০৩৯	৫২৬৪
২০১১/১২	৩৪১৮	৭৫৯	১১৪৫	৫৩২২
২০১২/১৩	৩২৪২	৯৩৪	১১৯৬	৫৩৭৩

উৎস: ১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৯৩-৯৪ সাল পর্যন্ত প্রদত্ত তথ্যসমূহ Minor Irrigation (ATIA প্রকল্প) থেকে সংগৃহীত। ১৯৯৪/৯৫ থেকে ২০০৮/০৯ সাল পর্যন্ত প্রদত্ত তথ্যসমূহ Irrigation Equipment Survey Report of BADC থেকে সংগৃহীত এবং ২০০৯/১০ পরবর্তী বছরের তথ্যের উৎস বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০১৪), অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি ৪

চালের বার্ষিক মূল্যের পরিবর্তন : ১৯৭২/৭৩-২০০৯/১০

সাল	মূল্য (টাকা/কেজি)	বিগত বছরের তুলনায় পরিবর্তনের হার (%)	৩ বছরের চলমান গড় (moving average)	চলমান গড় হতে মূল্যের পার্থক্য (%)	Linear Trend থেকে মূল্যের পার্থক্য (%)
১৯৭২/৭৩	২.০১	-	-	-	৩১.৩
১৯৭৩/৭৪	২.৬৯	৩৩.৬	৩.৪৪	-২১.৮	৩০.৯
১৯৭৪/৭৫	৫.৬১	১০৮.৬	৩.৮৮	৪৪.৭	৫৮.৩
১৯৭৫/৭৬	৩.৩৪	-৪০.৬	৩.৯৯	-১৬.৫	১৫.৬
১৯৭৬/৭৭	৩.০৩	-৯.১	৩.৩৬	-৯.৭	-৮.৯
১৯৭৭/৭৮	৩.৭১	২২.২	৩.৬০	২.৮	-১.৯
১৯৭৮/৭৯	৪.০৭	৯.৯	৪.৩৯	-৭.২	-৪.৭
১৯৭৯/৮০	৫.৩৯	৩২.৩	৪.৬৬	১৫.৭	১২.১
১৯৮০/৮১	৪.৫১	-১৬.৩	৫.২৭	-১৪.৪	-১৫.৭
১৯৮১/৮২	৫.৯১	৩০.৯	৫.৬২	৫.১	৩.৬
১৯৮২/৮৩	৬.৪৪	৯.১	৬.৪৫	-০.১	৪.০
১৯৮৩/৮৪	৭.০১	৮.৮	৭.১১	-১.৫	৫.০
১৯৮৪/৮৫	৭.৮৯	১২.৫	৭.৪৭	৫.৬	৯.৫
১৯৮৫/৮৬	৭.৫১	-৪.৮	৮.০৮	-৭.১	-১.৫
১৯৮৬/৮৭	৮.৮৫	১৭.৯	৮.৫৮	৩.২	৮.৫
১৯৮৭/৮৮	৯.৩৭	৫.৯	৯.৩৩	০.৫	৮.৪
১৯৮৮/৮৯	৯.৭৬	৪.১	৯.৫৩	২.৪	৭.২
১৯৮৯/৯০	৯.৪৭	-৩.০	৯.৯৭	-৫.১	-০.৭
১৯৯০/৯১	১০.৬৯	১২.৯	১০.৩৯	২.৯	৬.৩
১৯৯১/৯২	১১.০৩	৩.১	১০.২৮	৭.৩	৪.৮
১৯৯২/৯৩	৯.১২	-১৭.৩	৯.৯১	-৭.৯	-২০.৪
১৯৯৩/৯৪	৯.৫৭	৫.০	১০.২৯	-৭.০	-১৯.৭
১৯৯৪/৯৫	১২.১৯	২৭.৩	১১.২৫	৮.৩	২.১
১৯৯৫/৯৬	১১.৯৯	-১.৬	১১.৩২	৫.৯	-৩.৬
১৯৯৬/৯৭	৯.৭৯	-১৮.৪	১১.০৮	-১১.৭	-৩১.৮
১৯৯৭/৯৮	১১.৪৮	১৭.৩	১১.৬৮	-১.৭	-১৬.৬
১৯৯৮/৯৯	১৩.৭৭	১৯.৯	১২.৫০	১০.২	-০.৭
১৯৯৯/০০	১২.২৪	-১১.০	১২.৫৯	-২.৯	-১৭.২
২০০০/০১	১১.৭৫	-৪.২	১১.৮৩	-০.৭	-২৬.১
২০০১/০২	১১.৪৯	-২.২	১২.১১	-৫.৪	-৩৩.২
২০০২/০৩	১৩.০৮	১৩.৮	১২.৬৭	৩.১	-২০.৬
২০০৩/০৪	১৩.৪৩	২.৭	১৩.৯১	-৩.৬	-২১.১
২০০৪/০৫	১৫.২৩	১৩.৪	১৫.০৫	১.২	-৯.৯
২০০৫/০৬	১৬.৫০	৮.৩৪	১৬.৭৪	-১.৪	-৪.৪
২০০৬/০৭	১৮.৪৮	১২.০০	১৯.৯১	-৭.২	৪.২
২০০৭/০৮	২৪.৭৪	৩৩.৮৭	২৩.৩০	৬.২	২৬.৫
২০০৮/০৯	২৬.৬৯	৭.৮৮	২৫.০২	৬.৭	৩০.১
২০০৯/১০	২৩.৬৪	-১১.৪৩	-	-	১৯.০

উৎস: Dorosh, Shahabuddin and Farid (2004) এবং লেখকের গণনা ২০০০/০১-২০০৯/১০ সময়কালে।

সারণি ৫

মৌসুমভিত্তিক মোটা চালের মূল্যের তারতম্য

	১৯৭০	১৯৮০	১৯৯০
জানুয়ারি	০.৯২৩	০.৯৮৭	০.৯৭২
ফেব্রুয়ারি	০.৯৪২	১.০২১	১.০১১
মার্চ	০.৯৯৩	১.০৬৪	১.০৫২
এপ্রিল	১.০৪৯	১.০৯২	১.০৬২
মে	১.০১৮	১.০০৫	১.০০৭
জুন	১.০৭৫	০.৯৫৮	০.৯৯০
জুলাই	১.১১৫	০.৯৬৯	০.৯৯৭
আগস্ট	১.০৫৮	০.৯৫৫	০.৯৮৮
সেপ্টেম্বর	১.০৬৫	১.০০৯	১.০০৬
অক্টোবর	১.০২১	১.০০২	১.০১২
নভেম্বর	০.৯৫২	০.৯৮৩	০.৯৫২
ডিসেম্বর	০.৯০০	০.৯৪১	০.৯৪৪
সর্বোচ্চ মূল্য (Peak)	১.১১৫	১.০৯২	১.০৬২
সর্বনিম্ন মূল্য (Trough)	০.৯০০	০.৯৪১	০.৯৪৪
সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের অনুপাত (Ratio)	১.২৩৯	১.১৬১	১.১২৫

উৎস: Dorosh and Shahabuddin (1999)।